❖ Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনোভা মেহনাজ

রোলঃ ২১৬০২০০০৭

২৮ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনোভা মেহনাজ

রোলঃ ২১৬০২০০০৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসনোভা মেহনাজ, আইডিঃ ২১৬০২০০০৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tasnova Mehanaz

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ মে, ২০২৪ ইং

তাসনোভা মেহনাজ

আইডিঃ ২১৬০২০০০৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحي

ভূমিকা

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَلِيلِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালন। দুরুদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবিদের ওপর।

ভালো কিংবা খারাপ -দুই অভ্যাসেরই বীজ বপিত হয় শৈশবে। জীবন-সফরের শুরুতেই গড়ে ওঠা অভ্যাস বাকি জীবনের পুরোটা জুড়ে প্রভাবক হয়ে দাঁড়ায়। শিশু মননে ভালো অভ্যাসের রাজটিকা শুরুতেই এঁকে দিতে হবে।

দ্বীন শিক্ষা সন্তানের চরিত্র উন্নয়নে এবং তাদের মানবিক ও নৈতিক বিকাশে সাহায্য করতে পারে। এটি তাদের সঠিক ও সমাধানগত ভাবে জীবন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন। ধেয়ে আসা ফিতনার জামানায় নিজের ঈমান অটুট রাখতে জীবনের শুরু থেকেই দ্বীন শিক্ষার প্রয়োজন।

ইহজগতে মানবীয় জীবনে একজন ব্যক্তির ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান আমানতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে কতক বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া জরুরি। তন্মধ্যে সন্তানাদি প্রতিপালন ও তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া অন্যতম। সৎ সন্তান গড়তে হলে তাদেরকে বিশেষভাবে প্রতিপালন করতে হবে। তাদেরকে

সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে ভালো ও কল্যাণকর পরামর্শ এবং সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে। কেননা সন্তানরাই হলো সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বড় আমানত ও সম্পদ; যাদেরকে সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করার প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দেশনা দিয়েছেন।

যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার সময় এ আমানত সংরক্ষণের কথা বলেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষাকারী। (সূরা আল মা'আরিজ-৭০:৩২)

সন্তান প্রতিপালন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞের নাম, যা খেয়ালি মনে সম্পাদন করার বিষয় নয়। এর জন্য দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সঠিক পরিচর্যা। একটি সাধারণ চারাগাছও সঠিক পরিচর্যা ছাড়া ভালো ফল দেয় না; তার পেছনে সময় দিতে হয়। বপনের আগে বীজ বাছাই ও জমি প্রস্তত করতে হয়। আগাছা কর্তন ও পানি সিঞ্চন করতে হয়। পোকামাকড় থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। আর এই প্রত্যেকটি কাজ করতে হয় সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে, তবেই ভালো ফল ঘরে তোলা সম্ভব। একটি সাধারণ চারাগাছের ক্ষেত্রে যদি এতটা পরিচর্যার দরকার হয়, তবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে কী পরিমাণ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ প্রযোজন-তা সহজেই অনুমেয়। তাই আধুনিক যুগে প্যারেন্টিং বিষয়ে ধারণা থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা কেন দিবো?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْن.

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজেদের আমানতসমূহের, অথচ তোমরা জান।(সূরা আল-আনফাল-৮ঃ২৭)

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ﴿۲۸﴾

আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র, আর আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।(সূরা আল-আনফাল ৮ঃ২৮)

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে সন্তানাদির মত এই মহান সম্পদ নিয়ামত হিসেবে দান করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। (সূরা আশ-শুরা-৪২:৪৯)

তিনি তাদের উপর এই নিয়ামত আমানত হিসেবে দান করেছেন এবং তিনি পিতা-মাতার উপর সন্তানদের অধিকার সংরক্ষণ ও আবশ্যকীয় বিশেষ দায়িত্ব পালনের

বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছেন। আর তিনি এই মহান নিয়ামতকে পিতা-মাতার জন্য পরীক্ষা হিসাবে তৈরি করেছেন।

সুতরাং যদি পিতা-মাতা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সন্তানদের যথাযথ প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে; তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পরকালে মহা কল্যাণ, সাওয়াব ও প্রতিদান রেখেছেন। আর যদি তারা সন্তানদের যথাযথ যত্ন না নিতে পারে, তাদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে; তাহলে তারা শিথিলতা ও গাফলতি অনুসারে নিজেরাই নিজেদের নাফসের প্রতি শাস্তি আরোপ করল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد. ٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার- পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল। (সূরা আত-তাহরিম-৬৬:৬)

এই আয়াতটি অভিভাবকত্বের বাধ্যবাধকতা, প্রতিপালন এবং সন্তানদের। প্রতি গুরুতর মনোযোগ দেওয়ার বিষয়ে একটি দুর্দান্ত ভিত্তি বা মূলনীতি।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবন আবী তুলিব(রাঃ)এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : (قُوْا أَنْفُسَكُمْ

وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) قَالَ : عَلِّمُوهُمْ، وَأَدِبُوهُم.ْ

আলী ইবন আবী তুলিব এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে শিক্ষা দিন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করুন। (ইমাম ত্ববারী (মৃ. ৩১০ হি.), জামি'উল বায়ান ফি তাথিলিল কুরআন, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ১০৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে এই আদেশের ব্যাপারে একটি জোর- তাগিদ রয়েছে এবং পিতা-মাতার উপর এটি হলো একটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (ِ

তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।(সহীহুল বুখারী হাঃ ৫১৮৮; সহীহ মুসলিম হা: ১৮২৯)

হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বক্তব্য, “مَسْئُولٌ বা রক্ষক"। এটি এমন একটি অনুস্মারক যার মাধ্যমে বান্দাকে কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দায়িত্বশীলদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও আমানত সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহর জিজ্ঞাসার জওয়াব দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কতিপয় আহলুল ইলম বা বিদ্বানগণ এও বলেছেন,

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَسْأَلُ الْوَالِدَ عَنْ وَلَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ الْوَلَدَ عَنْ وَالِدِهِ فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ لِلأَبِ عَلَى ابْنِهِ حَقًّا، فَلِلابْنِ عَلَى أَبِيهِ حَق

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা পুত্রকে তার পিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার আগে কিয়ামতের দিন তার পিতাকে তার পুত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। নিশ্চয় পিতার যেমন সন্তানের উপর অধিকার রযেছে তেমনি সন্তানেরও তার পিতার উপর অধিকার রয়েছে। (ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তুহফাতুল মাউদুদ বি আহকামিল মাউলুদ, পৃ. ৩৩৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) স্বয়ং এ সম্পর্কে একজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ لِرَجُلٍ: " أَدِّبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَاذَا أَدَّبْتَهُ؟ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ؟ وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ. ً

আপনি আপনার নিজ সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিন, কারণ আপনিই আপনার সন্তানের জন্য দায়বদ্ধ। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি তাকে কতটুকু শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, আপনি তাকে কতটুকু জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন সে সম্পর্কে। বস্তুতঃ তাকেও আপনার প্রতি তাঁর সদয় অনুগ্রহ ও আনুগত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০, হা: ৫৩০১, ৫০৯৭)

যেমনটি আল্লাহ তা'আলা সন্তানদেরকে তাদের পিতামাতার প্রতি আনুগত্যশীল সন্তান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করা আবশ্যক করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) [العنكبوت.[٨ /

আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে।
(সূরা আল-আনকাবুত-২৯:০৮)

একইভাবে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকেও তাদের সন্তানদের প্রতিপালন ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের বিষয়ে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء١١ :

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন (সূরা আন-নিসা- ৪:১১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার বিষয়ে তার সন্তানদেরকে আগে নির্দেশ দান করেছেন। এরপর সন্তানদের বিষয়ে পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ সন্তানদের আগেই পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে এবং পিতা-মাতার পরে সন্তানদের রক্ষা ও প্রতিপালনের বিষয়ে নির্দেশ দান করেছেন।(তুহফাতুল মাওদুদ লি ইবনিল কাইয়্যিম, পৃঃ২২৯)

আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) আমাদের জানিয়েছেন, পিতামাতা তাদের সন্তানের উপর এক বিরাট প্রভাব ফেলে; তাদের আক্বীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। বিশেষত তাদের নৈতিকতা ও প্রাকৃতিক স্বভাবের ক্ষেত্রে। তাইতো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَاهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءُ.

প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ? (সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৫, হা। ১৩১৯, ১৩৮৫, ৫১৮৮, সহীহ মুসলিম হা। ১৮২৯)

এটি একটি গভীর অনুভবযোগ্য ও বাস্তব উদাহরণ। কেননা, একটি প্রাণী সাধারণত ত্রুটিবিহীন ও রোগমুক্ত স্বাস্থ্যকর প্রাণীকে জন্মদান করে। যার কোনও অঙ্গের অঙ্গহানি কিংবা তার হাত, কান বা পা কোন অঙ্গই কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন থাকে না। পরবর্তীতে কোনভাবে এসব পশুর কোন অঙ্গহানি হলে তা কেবল সেই পশুর মালিক কিংবা দায়িত্বশীলের অবহেলা কিংবা তার নিজ কর্মের ফলেই ঘটে থাকে।

তেমনিভাবে একজন সন্তান প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ফিতরাতের উপরই জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর সে যখন কোন মিথ্যা, প্রতারণা, দুর্নীতি ও কোন চারিত্রিক বিচ্যুতির স্বভাব শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা কোন গর্হিত ও পাপাচারের কাজে যুক্ত হয়, তখন এসব স্বভাবগুলো প্রকৃতপক্ষে তার ফিতরাহ এর বাহিরে চলে যায়। আর এসব মন্দ স্বভাব সৃষ্টির কারণ হলো, হয় সে সন্তানকে মন্দভাবে গড়ে তোলা হয়েছে বা তার প্রতি অবহেলা করা হয়েছে কিংবা তার অসৎ সঙ্গী-সাথীদের এবং বাহিরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ঘটে থাকে।

সন্তান মানবীয় জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমানত। তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা যেন সৎ সন্তান গড়ার এ মহান সম্পদ অর্জন করার তাওফিক দান করেন। কেননা কল্যাণ ও তাওফিক দানের একমাত্র ক্ষমতার মালিক হলেন সেই একক মহান সত্ত্বা যাঁর সাথে অন্য কারো অংশীদারিত্ব নেই।

এছাড়াও আমরা মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকল সন্তান-সন্ততিদের হেফাজত করেন যেমনভানে তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন। আর তিনি যেন তাদের তাওফীক দিয়ে ধন্য করেন। তিনি যেন তাদেরকে সৎ, আদর্শ ও কল্যাণময়ী সন্তানাদি দান করেন এবং তাদেরকে যাবতীয় ফিতনা ও বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা দান করেন। আমীন! নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সাড়াদানকারী।

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বশীলতা অনুধাবন

মুসলিম হিসেবে সন্তান প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব অনুধাবন করা খুব জরুরি। শিশুদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো ইত্যাদি বাধ্যবাধকতা বোঝা খুবই জরুরি। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

'মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারপরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ-হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ।' (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬)

এই আয়াতের অর্থ এবং প্রয়োগ কী? এখানে সাধারণভাবে প্রত্যেক মুমিনকে সাবধান করা হয়েছে যেন সে নিজেকে রক্ষা করে, নিজের পরিবার এবং সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে-যে আগুন ইতোমধ্যেই প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আছে এবং যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। এটি একটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা যা অবশ্যই সিরিয়াসলি গ্রহণ করা উচিত। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই প্রধান ফোকাস হওয়া উচিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَا تَعۡتَذِرُوا الۡيَوۡمَ ؕ اِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا تُوۡبُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ تَوۡبَةً نَّصُوۡحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمۡ اَنۡ يُّكَفِّرَ عَنۡكُمۡ سَيِّاٰتِكُمۡ وَ يُدۡخِلَكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۙ يَوۡمَ لَا يُخۡزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ ۚ نُوۡرُهُمۡ يَسۡعٰى بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَ بِاَيۡمَانِهِمۡ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اَتۡمِمۡ لَنَا نُوۡرَنَا وَ اغۡفِرۡ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۸﴾

'হে কাফির-সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে। মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবাহ

করো-আন্তরিক তাওবাহ। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ সেদিন নবি এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না...' (সূরা তাহরীম, ৬৬: ৭-৮)

বিচার-দিবসে কাফিরদের কুফরের পক্ষে কোনো অজুহাত চলবে না। এই আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে ইখলাসের সাথে তাওবাহ করতে বলেছেন যেন তিনি তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন যা ইতোমধ্যেই সুসজ্জিত অবস্থায় আছে। একজন ব্যক্তির চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ধারিত হবে দুনিয়াতে তার বিশ্বাস ও কাজকর্মের ভিত্তিতে। পিতা-মাতা ও সন্তানদের কাজের চিরস্থায়ী ফলাফল এই বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রিয় পাঠক! জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোনটি উত্তম? কোন ঠিকানার জন্য আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি?

দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম (নেতা) একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ (স্বামী) তার পরিবারবর্গের দায়িত্বশীল, তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল, তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হবে। খাদেম তার মুনিবের ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারি: ৮৯৩; মুসলিম: ১৮২৯)

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গুরুত্বারোপ করে জানিয়েছেন সন্তান প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব যা আন্তরিকভাবে ও সিরিয়াসলি পালন করতে হয়। পরকালের জীবনের জন্য শিশুদের প্রস্তুত করার প্রতি মনোযোগী হয়ে দুনিয়াতে পিতা-মাতা নিজের সন্তানের পরিচর্যা করেন, যত্ন নেন এবং তাদের সুরক্ষিত রাখেন। দায়িত্বশীলতার সাথে আসে জবাবদিহিতা, যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত কুরআনের আয়াতগুলোতে এসেছে। আল্লাহ প্রত্যেক পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের দায়িত্বের হিসাব গ্রহণ করবেন-বিচার-দিবসে তাদের সেই আমলনামা প্রদান করা হবে। ফলে সন্তান প্রতিপালন করার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হতে পারে অথবা ব্যর্থ হলে জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত হতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন নিছক একটি দায়িত্ব নয়, বরং এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। পিতা-মাতার হাতে পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে ওঠে যারা ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে হয়তো সফলতা অর্জন করবে অথবা ব্যর্থতার মুখ দেখবে। সুতরাং মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ ও সফলতা নির্ভর করে পিতা-মাতার সফলতার উপর। একজন শিশু অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে নিজের পিতা-মাতার মাধ্যমে বেশি প্রভাবিত হয়। সন্তানকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে পুরো সমাজকে প্রভাবিত করা যায়। পরিবার হলো সমাজ গঠনের 'বিল্ডিং ব্লক' বা ভিত্তি। আর ভিত্তি শক্তিশালী হলে পুরো সমাজ শক্তিশালী হবে। ফলে বাধ্যতামূলকভাবে পিতা-মাতাকে নিজের দায়িত্ব বুঝতে হবে। নিজেদের ভূমিকার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেই ভূমিকার সাথে জড়িত সকল দায়িত্বকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা

সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা এবং এই ব্যাপারে তারা বিচার-দিবসে জিজ্ঞাসিত হবেন, এই মৌলিক বিষয়টি সকল পিতা-মাতাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এর গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আল্লাহ বলেছেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم* ٌ

'এবং জেনে রেখো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। বস্তুত আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।' (সূরা আনফাল, ৮ঃ২৮)

অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم(ٌ

'তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।' (সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৫)

এই আয়াতগুলোতে যে-আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো 'ফিতনা' যার অনুবাদ 'পরীক্ষা', 'গুণগত মান যাচাই করা'। দুনিয়া নানাবিধ পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। এটা আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ যে, তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা, বিপদআপদ ও অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে বান্দাদেরকে যাচাই করবেন। সন্তান ও পরিবার সেই মান যাচাইয়ের একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ মুমিনদেরকে কাফিরদের থেকে পৃথক করেন এবং সত্যবাদী আন্তরিক ব্যক্তিদেরকে মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের থেকে পৃথক করেন। আল্লাহ বলেছেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

'লোকেরা কি মনে করে রেখেছে-আমরা ঈমান এনেছি-কেবলমাত্র এ কথাটুকু বলোনেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি ক্যালে পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।' (সূরা আনকাবুত, ২৯: ২-৩)

আল্লাহ মানুষকে বিপদআপদ এবং নিয়ামাত উভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন এবং জেনে নেন কারা ধৈর্যশীল, শোকর আদায়কারী, কারা অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য। তিনি যাচাই করে নেন কারা তাঁর বাধ্যগত বান্দা হতে চায় এবং কারা অবাধ্যগত ও উদ্ধত। এরপর বিচার-দিবসে ফলাফল অনুসারে তিনি কাউকে শাস্তি এবং কাউকে পুরস্কার প্রদান করবেন। আল্লাহ নানাভাবে বিপদ আপদের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করেন। তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, ফল-ফসলের ক্ষতি, সম্পদের ক্ষতি, জীবন এবং বাসগৃহের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তিনি কাউকে সন্তান দিয়ে কিংবা কাউকে সন্তান না দিয়েও পরীক্ষা করেন। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। এবং যখনই কোন বিপদ আসে তারা বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। তারা সে-সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াত-প্রাপ্ত।' (সূরা বাকারাহ, ২:১৫৫-১৫৭)

পরীক্ষা এবং বিপদআপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রহমত, যেন এগুলোর কারণে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাওবাহ করে এবং আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়কে পরিত্যাগ করে-যেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। তিনি আমাদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন যেন আমাদের অন্তরগুলো পরিশুদ্ধ হতে পারে এবং মৃত্যুর পূর্বেই তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে আমরা ফিরে আসতে পারি। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون َ

'সেই বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই (কোনো-না-কোনো) ছোট শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করাতে থাকব, হয়তো তারা (নিজেদের বিদ্রোহাত্মক নীতি থেকে) বিরত হবে।' (সূরা সাজদা, ৩২: ২১)

আবার কখনও আল্লাহ তাঁর বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্যেও পরীক্ষা করেন এবং তাদের গুনাহ মোচন করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে-সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারি: ৫৬৪০;মুসলিম: ২৫৭২)

তিনি আরও বলেছেন,

'মুমিন নারী ও পুরুষ জান-মাল ও সন্তানের বিষয়ে বিপদের সম্মুখীন হতেই থাকে, যতক্ষণ-না সে এমনভাবে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করে যে, তার কোনো পাপ অবশিষ্ট নেই।(তিরমিযি: ২৩৯৯, সহীহ) (অর্থাৎ মুমিনের জন্য বিপদ ও ফিতনাও নিয়ামাত, যার ওসিলায় আল্লাহ গোনাহ মাফ করেন)।

অধিকাংশ মানুষ ভুলে যায় যে বিভিন্ন নিয়ামাত দিয়েও আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ ধনসম্পত্তি, সন্তানসন্ততি আমাদের জন্য পরীক্ষা এবং আমানত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যাচাই করবেন এবং জেনে নিবেন কারা তাঁর প্রতি শুকরিয়া আদায় করে কিংবা কারা পরিবার ও সন্তানের কারণে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। দুনিয়াতে অনেক মানুষ ধনসম্পত্তি, বৈষয়িক বিষয়াদি এবং সন্তান সন্ততির প্রতি নিমগ্ন হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। এগুলো আল্লাহর ইবাদাত ও স্মরণ থেকে মানুষকে উদাসীন ও অমনোযোগী করে দেয়।

পরীক্ষা শুধুমাত্র কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ পৃথক করাতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কীভাবে পিতা- মাতা নিজের সন্তানকে বড় করেন, সেখানেও রয়েছে পরীক্ষা। তারা কি তাদের সাথে দয়া, ভালোবাসা এবং সম্মানজনক আচরণ করেন? তারা কি তাদেরকে ইসলামের সকল বিষয়ের জ্ঞান ও নিয়ামাত-সহকারে বড় করেন? তারা কি তাদেরকে আখিরাত এবং জান্নাতের জন্য প্রস্তুত করে দেন? নাকি তারা সন্তানদেরকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সেক্যুলার মতাদর্শ ও বিধর্মীদের আচার-অনুষ্ঠান অনুসারে বড় করেন? তবে কি তারা সন্তানদের সাথে নিজেরাও জাহান্নামে যেতে চান? সুতরাং, এগুলো হলো পরীক্ষার প্রকৃত বাস্তবতা। এভাবে অন্যান্য সকল পরীক্ষাতেও আল্লাহ আমাদের যাচাই করেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ এই পরীক্ষাতে ব্যর্থ। তারা যত সম্ভব এই পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে চান। সপ্তাহে প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা বা এর থেকেও বেশি সময় সন্তানকে ডে-কেয়ার কিংবা কাজের মানুষের কাছে রেখে দেন, যাদের কাছে শিশু নিজের সন্তানকে ও মানসিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে বাধ্য হয়। শিশুর যত্ন নেওয়ার চেয়ে শামান্য বিষয়ে পিতা-মাতারা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন, যেমন: ক্যারিয়ার, অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা, নিজের শখ-আহ্লাদ পূরণ করা অথবা বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোতে তারা ব্যস্ত থাকেন। বিভিন্ন প্রজেক্টে নিজেদের সময় ও শ্রম ব্যয় করেন, কিন্তু সন্তানদের জন্য তাদের কোনো সময় নেই, মনোযোগ নেই। বর্তমান দুনিয়ায়

শিশুরা পিতা-মাতার যথেষ্ট সময় এবং মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলাফল?-পুরো সমাজ নানারকম সমস্যায় আক্রান্ত।

পিতা-মাতারা খেয়াল করেন না সন্তানের প্রতি অবহেলার মাধ্যমে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তারা একটি সোনালি সুযোগ হাতছাড়া করছেন। সন্তানের পরিচর্যার মাধ্যমে চিরস্থায়ী ও আধ্যাত্মিক পুরস্কার অর্জন করা যায়। এই সুযোগ তাদের চোখের সামনেই রয়েছে, কিন্তু তারা এর ফায়দা উঠাতে ব্যর্থ। সন্তান প্রতিপালনের জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না কষ্ট যত বড়, পুরস্কারও তত বেশি। পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার অর্জন করা সম্ভব। সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমে ধৈর্য, নিঃস্বার্থতা এবং আত্মত্যাগের পরীক্ষা দিতে হয়। আল্লাহ বলেছেন,

َأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِين

'তোমাদের কি ধারণা-তোমরা এমনিই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।' (সূরা আল ইমরান, ৩: ১৪২)

এই পরীক্ষায় ঠিকঠাক পাশ করে গেলে পিতা-মাতার মধ্যে নানা রকমের সদ্‌গুণ বিকশিত এবং সুদৃঢ় হয়। সন্তানের মধ্যে ঈমানি যোগ্যতা বিকাশের লক্ষ্যে পিতা-মাতা শুধু সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না, বরং তাদের নিজেদের মধ্যেও সেই যোগ্যতার বিকাশ ঘটান। এ বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক। সন্তানকে ঈমানদার হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে অজান্তেই নিজের ঈমানের পরিচর্যা নেওয়া হয়ে যায়। এভাবে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও রহমতের রহস্য বুঝতে পারে। দুনিয়ায় থেকেই জান্নাতের স্বাদ পাবার কি আর কোনো সুযোগ আছে?

সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার ও আনন্দ

যে-কোনো দায়িত্বের মতো পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনের মধ্যেও রয়েছে পুরস্কার ও থেকে পুরস্কার অনেক বেশি। বস্তুত এর মাধ্যমে দুনিয়াতেই আল্লাহর তরফ থেকে অসাধারণ সব পুরস্কার পাওয়া যায়, যেমন: সন্তানের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, বন্ধন ও মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতা, বিভিন্ন খুশির মুহূর্ত শেয়ার করা, হাসিমুখের একটি চাহনি, উষ্ণ আলিঙ্গন এবং যত্নের ছোঁয়া। একবার শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, শিশুর কোমল ত্বকের স্পর্শ অনুভব করুন, তার মিষ্টি কণ্ঠের আওয়াজ শুনুন! তা হলে আপনি বুঝতে পারবেন এই উপহারের সৌন্দর্য কত বেশি! এ যেন জান্নাতের এক টুকরো আল্লাহ দুনিয়াতেই আমাদের দিয়ে দিয়েছেন!

সর্বোপরি, নিবেদিতপ্রাণ পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বড় হতে দেখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কেননা, যে সন্তান আল্লাহকে ভালবাসবে, আনুগত্য করবে, সমাজে উত্তম অবদান রাখবে এবং পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দুআ করবে-সেই সন্তানের মাধ্যমে পিতা-মাতার আমলনামা নেকী যোগ হতে থাকবে। নেক সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি ব্যতিক্রম বিষয় ছাড়া তার আমলনামায় কিছুই যুক্ত হয় না- সদাকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং পিতা-মাতার জন্য নেক সন্তানের দুআ।(মুসলিম: **১৬৩১**)

সুতরাং, নেক সন্তান রেখে যাওয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও নেক আমল লাভ করতে থাকে-যা বিচার-দিবসে তার জন্য উপহার হিসেবে উপস্থিত হবে। অতএব, সন্তানের পেছনে পিতা-মাতার সকল প্রচেষ্টাই বিরাট পুরস্কার বয়ে আনে!

সন্তান প্রতিপালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

কীভাবে মা-বাবা এবং সন্তান নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে? কীভাবে আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব আদায় হতে পারে? কীভাবে আল্লাহর প্রতিশ্রুত সুখ-শান্তি অর্জন করতে পারে? নিজের সন্তানের জন্য কী লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত? এই পয়েন্টগুলো সমস্ত বই জুড়েই আলোচিত হবে। প্রথমে আমাদের নিজেদের জন্য ও সন্তানদের জন্য কিছু লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুরু করা যাক।

লুকমান হাকীম এর ঘটনা

সূরা লুকমানে আমরা লুকমান আলাইহিস সালাম-এর বিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশের আলোচনা দেখতে পাই। এগুলো তিনি নিজের সন্তানকে প্রদান করেছিলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد[12] ٌ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم[13] ٌ

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير[14] ُ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون[15] َ

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير[16] ٌ

يَا بُنَيَّ أَقِمْ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور[17] ِ

وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور ٍ [18]

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير19] ِ

'আমি লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে, তার ব্যাপারে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসিত। স্মরণ করো যখন লুকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বলল, হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম। আর প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি।

তার মা দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু-বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে। (এ জন্য আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যার ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো কিন্তু মেনে চলো সে ব্যক্তির পথ, যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমারই দিকে। সে সময় তোমরা কেমন কাজ করছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে

দেবো। (আর লুকমান বলেছিল), হে পুত্র! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তা হলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন। হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভঙ্গিতে, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে। নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।' (সূরা লুকমান, ৩১: ১২-১৯)

প্রথম উপদেশঃ "হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলুম।" (সূরা লুকমান, ৩১:১৩)

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমে তিনি তার ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন সন্তান তাকে অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হল যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি। তাই তিনি তার ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরিক করা হতে বেঁচে থাক। যেমন,মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা পীর-আউলিয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রসূল বলেন, "দু'আ হল ইবাদত"। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির নিকট দু'আ করার অর্থ হল, সৃষ্টির ইবাদত করা, যা শিরক।

দ্বিতীয় উপদেশ : "আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ

ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতরে এবং প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।" (সূরা লুকমান, ৩১৪ ১৪)

তিনি তার ছেলেকে কেবলই আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করার সাথে সাথে মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। কারণ, মা-বাবার অধিকার সন্তানের উপর অনেক বেশি। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধ- পান ও ছোটবেলা লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক জ্বালা- যন্ত্রণা ও কষ্ট সইতে হয়েছে। তারপর তার বাবাও লালন- পালনের ব্যয়ভার, লেখাপড়া ও ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করছেন এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছেন। তাই তারা উভয়ই সন্তানের পক্ষ হতে অভিসম্পাত ও সেবা পাওয়ার অধিকার রাখে।

তৃতীয় উপদেশঃ "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে শিরক করতে পীড়াপীড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো।" (সূরা লুকমান, ৩১: ১৫)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'যদি তারা উভয়ে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে তাদের দ্বীনের আনুগত্য করতে বাধ্য করে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। তবে তারা যদি দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে কোন প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের দ্বীন কবুল না করা তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তুমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে। আর মু'মিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।'

চতুর্থ উপদেশঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা [পাপ-পুণ্য] যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।” (সূরা লুকমান, ৩১: ১৬)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, অন্যায় বা অপরাধ যতই ছোট হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে (দাড়িপাল্লায়) ওজন দেয়া হবে। যদি তা ভালো হয়, তাহলে তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দেয়া হবে।

পঞ্চম উপদেশঃ "হে আমার প্রিয় বৎস সলাত কায়েম কর।" (সূরা লুকমান, ৩১:১৭)

তুমি সলাতকে তার ওয়াজিবসমূহ ও রোকনসমূহ সহ আদায় কর। সমাজে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত প্রতিষ্ঠা কর।

ষষ্ঠ উপদেশঃ "তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ কর।" (সূরা লুকমান, ৩১:১৭)

বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদের সাথে কোন প্রকার কঠোরতা করো না।

সপ্তম উপদেশঃ "যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার উপর তুমি ধৈর্যধারণ কর।" (সূরা লুকমান, ৩:১৭)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তখন তোমার করণীয় হল, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

অষ্টম উপদেশঃ "আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।" (সূরা লুকমান, ৩১:১৮)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, 'যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার সাথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের উপর অহংকার করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে না। তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে কথা বলবে। তাদের জন্য উদার হতে হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে।'

"অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাটা চলা করবে না।" (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ১৮)

কারণ, এ ধরনের কাজের কারণে আল্লাহ কাউকে পছন্দ করেন না। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না।

দশম উপদেশ : "আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।" (সূরা লুকমান, ৩১:১৯)

খুব স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটা যাবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও না। মধ্যম পন্থায় চলাচল করতে হবে অর্থাৎ নমনীয় হয়ে হাটা চলা করা অভ্যাস করতে হবে। চলাচলে যেন কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়।

একাদশ উপদেশ: নরম সুরে কথা বলা। লুকমান তার ছেলেকে নরম সুরে কথা বলতে আদেশ দেন।

"তোমার আওয়াজ নিচু কর।" আর কথায় কথায় কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। "নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ।" (সূরা লুকমান, ৩১: ১৯)

আল্লামা মুজাহিদ বলেন, 'সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ। অর্থাৎ মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের মত হয়। এবং এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা প্রমাণ করে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা নিষেধ। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

পূর্বের আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা

❖ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যেসব কাজ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়, বাবা তার ছেলেকে সে বিষয়ে উপদেশ দেবে।

❖ উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাওহীদের উপর অটল ও আবচল থাকতে উপদেশ দেয়ারক থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেবে কাকার শিরক হস হবে এক যুলুম বা অন্যায় যা মানুষের সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়।

❖ প্রত্যেক ঈমানদারের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হল মা বাবার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায় করা। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার না করা এবং তাদের উভয়ের সাথে সু সম্পর্ক বজায় রাখা।

❖ আল্লাহর অবাধ্যতা হয় না এমন কোন নির্দেশ যদি মা-বাবা দিয়ে থাকে তখন সন্তানের উপর তাদের নির্দেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যদি আল্লাহর অবাধ্যতা হয়, তবে তা পালন করা ওয়াজিব নয়।

❖ প্রত্যেক ঈমানদারের উপর কর্তব্য হল, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মু'মিন-মুসলিমদের পথের অনুসরণ করা, আর অমুসলিম ও বিদ'আতীদের পথ পরিহার করা।

❖ প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে কোন নেক-কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না এবং কোন খারাপ-কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে ছোট মনে করা যাবে না এবং তা পরিহার করতে কোন প্রকার অবহেলা করা চলবে না।

❖ সলাতের যাবতীয় আরকান ও ওয়াজিবগুলিসহ সলাত কায়েম করা প্রত্যেক মু'মিনের উপর ওয়াজিব; সলাতে কোন প্রকার অবহেলা না করে, সলাতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া এবং খুশুর সাথে সলাত আদায় করা ওয়াজিব।

- ❖ জেনেশুনে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। না জেনে এ কাজ করলে অনেক সময় হিতে-বিপরীত হয়। আর মনে রাখতে হবে, দায়িত্ব পালনে যথা সম্ভব নমনীয়তা প্রদর্শন করতে হবে; কঠোরতা পরিহার করতে হবে।

- ❖ মনে রাখতে হবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণকারীকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্যের কোন বিকল্প নেই। ধৈর্য ধারণ করা হল একটি মহৎ কাজ। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

- ❖ হাঁটা-চলায় গর্ব ও অহংকার পরিহার করা। কারণ, অহংকার করা সম্পূর্ণ হারাম। যারা অহংকার ও বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।হাঁটার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাটতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটা ঠিক 'নয় এবং একেবারে ধীর গতিতেও হাঁটা ঠিক নয়।

- ❖ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ, অধিক উচ্চ আওয়াজ বা চিৎকার করা হল গাধার স্বভাব। আর দুনিয়াতে গাধার আওয়াজ হল সর্ব নিকৃষ্ট আওয়াজ।

এই কয়েকটি আয়াতে পিতা-মাতার জন্য হিকমতের গুপ্তভাণ্ডার সংরক্ষিত রয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকে শিশুদের জন্য অনেক মূল্যবান লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় :

- বিশুদ্ধ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর উপরে ঈমান অর্জন এবং শিরক বর্জন।

- পিতা-মাতার প্রতি দয়া, শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য প্রদর্শন।

- তাকওয়া (আল্লাহ-সচেতনতা) অর্জন এবং তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের ব্যাপারে সচেতন থাকা।

- সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে সালাত কায়েম করা।

- সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা।

- জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলো ধৈর্য-সহকারে অতিক্রম করা।

- বিনয় এবং মিষ্টতা অবলম্বন করা।

- মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং চরমপন্থা পরিহার করা।

এগুলোর সাথে আরও কয়েকটি বিষয় সংযুক্ত করা যায়:

১. ঈমান-আকীদায় দৃঢ়তা অর্জন।

২. কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে সম্পর্ক গড়া।

৩. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও কিতাবের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা।

৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা।

৫. সকল বিষয়কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হতে অনুধাবন করা।

৬. ইসলামি ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ এবং পরিচয়ের বিকাশ।

৭. ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে লেনদেন করা।

৮. সকল মানুষের প্রতি দয়ালু, মমতাময় এবং সুন্দর ব্যবহার করা।

৯. বিশ্বের সকল মুসলিমদের অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়া (সহায়তা প্রদান,তাদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা)।

১০. মানুষকে আল্লাহ এবং ইসলামের দিকে আহ্বান করা।

১১. মুসলিম পরিচয়ে সম্মান অনুভব করা।

আরো কিছু কাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে:

- আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া
- অনুপ্রাণিত হওয়া
- দায়িত্বশীলতা
- অধ্যবসায়ী, কঠোর পরিশ্রমী হওয়া
- সক্ষমতা এবং দক্ষতা অর্জন

- সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকা
- সততা
- বিশ্বস্ততা
- সাহসিকতা
- নেতৃত্ব

এসব লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে আমরা সন্তানের ঈমান, আকিদা এবং তাকওয়ার বিকাশ ঘটাতে পারি। বস্তুত এভাবে ব্যক্তির ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-পরিয়চয় গঠিত হয়। এটা তার মন ও মননের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তার সকল প্রচেষ্টা ব্যয় হবে ঈমান ও ইহসানে পরিপূর্ণ একটি ইসলামি জীবন অতিবাহিত করার লক্ষ্যে। এভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সত্যিকার সফলতা অর্জিত হয়। পরিশেষে, পিতা-মাতা এবং সন্তান-উভয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত অর্জিত হয়!

শিশুদের প্রতি নাবী মুহাম্মাদ(ﷺ)এর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত

নাবী মুহাম্মাদ(ﷺ)-এর অন্তরে শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। একবার নাবী মুহাম্মাদ(ﷺ)-এর কানে হুসাইন(রাঃ)-এর কান্নার শব্দ এলো। এতে তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হলেন। তিনি ফাতিমা-কে বললেন, তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়? আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ(ﷺ) শিশু-কিশোরদের কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে তাদের সালাম করতেন। একবার রসূলুল্লাহ(ﷺ) ভাষণদানের নিমিত্তে মিম্বরে আরোহণ করে দেখতে পেলেন যে, হাসান ও হুসাইন দৌড়াদৌড়ি করছেন এবং

পা পিছলে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাষণদান বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে এলেন। শিশু দু'টির দিকে অগ্রসর হয়ে দুই বাহুতে উঠিয়ে নিলেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের ধন-সম্পদ এক পরীক্ষার বস্তু, আল্লাহর এ বাণী সত্যিই।

একদিন রসূলুল্লাহ(ﷺ) সলাত আদায় করছিলেন। আর তখন হাসান ও হুসাইন এসে তাকে সিজদারত অবস্থায় পেয়ে একেবারে পিঠে চড়ে বসলেন। তিনি সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন। আর তারা পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত তাদেরও নামিয়ে দিলেন না। রসূলুল্লাহ(ﷺ) সালাম ফিরালে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আপনি সিজদা দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমার নাতিদ্বয় আমাকে ঘোড়া বানিয়েছে। কাজেই তাদের তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেয়াটা আমার পছন্দ হয়নি।

রসূলে কারীম(ﷺ) কখনো কখনো শিশুদের কান্না শুনতে পেলে সলাত সংক্ষেপ করে দিতেন। আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ(ﷺ) এর তুলনায় সন্তান-সন্ততির প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী আমি কাউকে দেখিনি। তার পুত্র ইবরাহীম। মদিনার উঁচু স্থানে ধাত্রীমায়ের কাছে দুধপান করতেন। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং আমরাও তার সঙ্গে যেতাম। তিনি ওই ঘরে যেতেন অথচ সেই ঘরটি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ ইবরাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিলেন একজন কর্মকার। তিনি ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, এরপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ইবরাহীম ইন্তেকাল করেন তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)বললেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। সে দুধপানের বয়সে ইন্তেকাল করেছে। সুতরাং জান্নাতে তাকে একজন ধাত্রী দুধপান করাবে। নাবী(ﷺ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের যত্ন নেবে এবং তাদের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। নাবী আরও বলেছেন, তোমরা শিশুদের ভালোবাস এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাদের সঙ্গে কোনো

ওয়াদা করলে তা পূর্ণ কর। কেননা তারা তোমাদেরকে তাদের রিজিক সরবরাহকারী বলে জানে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, নাবী(ﷺ)-এর অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, সবার জন্য নিবেদিত। তিনি শিশুদেরকে খুব ভালোবাসতেন, আদর করতেন, স্নেহ করতেন। কাজেই আমাদেরও শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা রাখা উচিত। ইবন উমর বলেন, রসূলে কারীম(ﷺ)-এর নেতৃত্বাধীন কোনো যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতে রসূলে কারীম(ﷺ) গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। তিনি শিশুদের এতটাই ভালোবাসতেন অথচ আমাদের সমাজের শিশুরা কতই না অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত। আমরা কি পারি না এই বঞ্চিত শিশুদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করতে?

সন্তান প্রতিপালনের বুনিয়াদি বিষয়সমূহ

শিশুদের ঈমান বিকাশের মূখ্য বিষয়গুলো আলোচনার পূর্বে সন্তান প্রতিপালনের মৌলিক কিছু বিষয়ে আলোচনা করা জরুরি। এর মাধ্যমে একটি ভিত্তি স্থাপিত হবে। এই অধ্যায়ে বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব এবং সন্তান প্রতিপালনে এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরো আলোচিত হয়েছে নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের ভূমিকা, সন্তানের ঈমান বিকাশের পূর্বে পিতা-মাতার নিজেদের ঈমানের পরিচর্যার গুরুত্ব, সন্তানের মৌলিক অধিকার (পিতা মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য), পিতা-মাতার অধিকার (সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য), শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর গুরুত্ব, শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক, মা ও শিশুর প্রথম অনুরাগ ইত্যাদি বিষয়সমূহ। শেষ অংশে নেক সন্তান কামনা করে আল্লাহর কাছে দুআ করার কিছু মূল্যবান উপদেশ সংযুক্ত রয়েছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِن

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে।' (সূরা রুম, ৩০ : ২১)

সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। যে-কোনো কাঠামো নির্মাণের জন্য প্রথমে একটি 'বিল্ডিং ব্লক' প্রয়োজন হয়, পরিবার হলো সমাজের সেই 'বিল্ডিং ব্লক'বা ভিত্তি। এ কারণে শারীআতের বহু বিধানের মাধ্যমে পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই পরিবারের অন্যান্য সকল বিষয় আবর্তিত হয়। যদি এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি সুচারু এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করে, তা হলে আশা করা যায় বাকি 'সিস্টেম' ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। আর যদি বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো ধরনের অনৈক্য, ফাটল বা মতভেদ দেখা দেয়, তা হলে সম্পূর্ণ সিস্টেমে গোলযোগ সৃষ্টি হবে। একটি শক্তিশালী বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একটি কার্যকর পরিবার গড়ে ওঠে। এভাবে সমাজের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ইসলামে বিয়ের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সক্ষমতা রাখে, সে যেন বিয়ে করে ...(বুখারিঃ৫০৬৫)

বিয়ে ইবাদাতের একটি অংশ এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে অগ্রগামী করার এক বিরাট সুযোগ। আল্লাহ পৃথিবীর সকল নারী পুরুষকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং বৈবাহিক বন্ধনে পবিত্রতা দান করেছেন। ফলে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাহচর্যে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে, একে অপরের কাজে সহযোগিতা করে এবং আল্লাহর ইবাদাতে পরস্পর সহযোগী হয়ে যায়। যখন আমরা বৈবাহিক

সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি, তখন আমাদের জীবনে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রশান্তির (সাকিনা) বাস্তব ফল দেখতে পাই।

বিয়েকে ইবাদাতে রূপান্তরিত করার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া জরুরি। বিয়ের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং শারীআতের বিধান অনুসারে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা। বিবাহিত দম্পতিকে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন ও আনুগত্যে অগ্রগামী হওয়ার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। নিজেদের ঈমান বিকশিত করার জন্য এবং তাকওয়া জাগ্রত রাখার জন্য ইলম অর্জনের বিকল্প নেই। জীবনে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভিত্তি হতে হবে কুরআনের শিক্ষা এবং রাসূলের সুন্নাত। এভাবে তারা তাদের সন্তানদের একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত পরিবেশে বড় করতে পারবেন।

বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াদি

সন্তান জন্মের পূর্ব থেকেই আমাদেরকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। প্রস্তুতির শুরুতেই প্রয়োজন ভালো ও নেককার স্ত্রী নির্বাচন করা।

সৎ স্ত্রী নির্বাচন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। "

(সূরা নূর: ৩২)

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত স্ত্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি ভালোভাবে খেয়াল করে সৎ ও নেককার স্ত্রী নির্বাচন করা। যেমনটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন, "চারটি বিষয় দেখে নারীকে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদের কারণে, তার বংশ মর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে, তার দীনদারিতার কারণে। অতএব তুমি দীনদার মেয়ে বিবাহ করে সুখী ও সফল হও, অন্যথায় তুমি ধ্বংস হও। " (সহীহ বুখারী: ৭/৭, হা. নং ৫০৯০)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

"আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুনিয়া একটি সম্পদ। আর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নেককার সতী নারী। " (সহীহ মুসলিম: ২/১০৯০, হা. নং ১৪৬৭)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا: فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا أَعْلَمُ ذَلِكَ لَكُمْ. قَالَ: فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرٍ فَأَدْرَكَهُ، وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ: لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ.

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, তাহলে আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করব? উমার রাযি. বললেন, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তা জেনে আসছি। অতঃপর তিনি উটে উঠে রওয়ানা হলেন এবং আমি তাঁর পেছনে চললাম। তিনি গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করব? তিনি বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার হৃদয়কে বানায় কৃতজ্ঞতা আদায়কারী, জিহ্বাকে যিকিরকারী এবং এমন স্ত্রী নির্বাচন করে, যে তাকে আখিরাতের বিষয়ে সাহায্য করবে। " (মুসনাদে আহমাদ: ৩৭/১১০, হা. নং ২২৪৩৭)

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: يَا مُعَاذُ، قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانُ ذَاكِرُ، وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ، وَدِينِكَ خَيْرُ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ.

আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয বিন জাবাল রাযি.-কে বললেন, "হে মুআয, কৃতজ্ঞতা আদায়কারী হৃদয়, যিকিরকারী জিহ্বা এবং নেককার স্ত্রী, যে তোমাকে তোমার পার্থিব ও দীনি কাজে সাহায্য করবে- এগুলো মানুষের উপার্জিত সম্পদের মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম। " (শুআবুল ঈমান: ৬/২৪৭, হা. নং ৪১১৬)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করতে নির্দেশ দিতেন এবং সন্ন্যাসী হওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, "তোমরা সোহাগিনী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী নারীদের বিবাহ কর। নিশ্চয় আমি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবী থেকে বেশি উম্মতের অধিকারী হবো। " (মুসনাদে আহমাদ: ২০/৬৩, হা. নং ১২৬১৩)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.

উতবা বিন উআইম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তোমরা কুমারী নারীদের বিবাহ করবে। কেননা তারা মিষ্টভাষী, নির্মল জরায়ুধারী এবং অল্পতেই তুষ্ট। " (সুনানে ইবনে মাজাহ:১/৫৯৮,হা. নং ১৮৬১)

সুতরাং একজন ব্যক্তির জীবনের সৌভাগ্যতার একটি অংশে হলো সৎ স্ত্রী পাওয়া। কেননা সৎ স্ত্রীর মাঝে এমন কতক সততাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকে যা ব্যক্তির জীবনকে সুখকর ও সৌভাগ্যময় করে। তাদের মধ্যে যেসব ভালো বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকে তা হলো, তাদের মধ্যে ইখলাস থাকে, কল্যাণকামিতা থাকে, সততা-আমানতদারিতা ও আমানত পূর্ণ করার গুণ থাকে, তারা সম্পদ সংরক্ষণ করে, স্বামীর মর্যাদা ও ইজ্জত রক্ষা করে চলে। সর্বোপরি তারা সন্তান প্রতিপালনে উত্তম প্রতিপালন করে। তারা সৎ সন্তান গড়তে সত্যিকার চমৎকার প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ তারা সন্তানদের

সাথে গভীর ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্বদা লেগে থাকে। সুতরাং বলা যায়, সৎ ও আদর্শবাদী স্ত্রীর মাঝে রয়েছে সৌভাগ্যের সমষ্টি।

একজন নেককার স্বামী ও নেককার স্ত্রী মিলেই গঠিত হয় একটি নেককার সুখী পরিবার। কারণ ভালো ও উত্তম মাটি থেকেই উৎপন্ন হয় ভালো ও উন্নতমানের উত্তম ফসল। আর খারাপ ও নিম্নমানের মাটি থেকে উৎপন্ন হয় নিম্ন ও অনুন্নত ফসল।

সন্তানগ্রহণের প্রস্তুতি

একজন নারী ও পুরুষ দাম্পত্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পর নতুন একটি পরিবার গঠনের স্বপ্ন দেখে। বৃহৎ একটি সংসারে থেকেও তারা একান্ত নিজস্ব একটি পরিমণ্ডল গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সাধের আল্পনায় সেই পরিমণ্ডলকে সাজিয়ে রাখার অদম্য আকর্ষণ অনুভব করে। তখন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী তাদের মধ্যে সন্তানের অভাব-বোধ সৃষ্টি হয়। সন্তান ছাড়া নিজেদেরকে অপূর্ণ মনে হতে থাকে। কোলাহলপূর্ণ পরিবারও শূন্য ও নিরানন্দ মনে হতে থাকে। তাই ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজন ও অবস্থানের কথা চিন্তা করে তারা সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কিন্তু আমাদের চিরায়ত সমস্যা-অজ্ঞতা ও অসতর্কতার কারণে তারা সন্তানগ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভুলে যায়। এটাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে। অথবা প্রস্তুতির ব্যাপারটি তাদের চিন্তায়ও আসে না। ফলে অনেক দম্পতিকেই আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায়-

'আমরা সন্তান নিতে চাইনি। দুর্ঘটনাবশত গর্ভসঞ্চার হয়ে গেছে। এখন কী করবো?'

এই কী করবো-এর উত্তরে একশ্রেণির দম্পতি অনাগত সন্তানকে অমোঘ নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়। একারণে মনঃকষ্টে ভোগে। আরেক শ্রেণির দম্পতি হারাম পন্থা অবলম্বন করে নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কিন্তু সঙ্গত কারণেই উপর্যুক্ত দুই শ্রেণির কোনো শ্রেণিই সুখ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না। যারা সন্তানকে দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করে তারা তো নয়-ই;এমনকি যারা সন্তানকে পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার আগেই হত্যা করে তারাও নয়। কেননা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই যে-দম্পতি তাকে দুর্ঘটনা ও দুর্ভাগ্য বলে বিচার করে তারা কখনোই নবজাতক সন্তানকে নিয়ে সুখী হতে পারে না। আর যারা নিজেদের অস্তিত্বের কণাগুলো প্রাণময় হওয়ার অপরাধে সেগুলোকে হত্যা করে ফেলে তারা প্রায়শই নিঃসন্তান থেকে যায়। গর্ভপাতের অস্থায়ী উপায় কখনো কখনো তাদের জন্য স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়।

অথচ গর্ভধারণ কোনো দুর্ঘটনা নয়। অবচেতনে ও অসতর্কতায় দেখা কোনো দুঃস্বপ্নও নয়; বরং এটা আকাশসম স্বপ্ন ছোঁয়ার প্রথম সিঁড়ি। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কাজেই সন্তানগ্রহণের পূর্বে নিজেদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কারণ, সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ব্যাপার।

এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রস্তুতি না-থাকার কারণে অনেক সময় গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসবের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। অসুস্থ শিশু জন্মলাভ করে। নবজাতককে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। শিশুর মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তিক্ততা শুরু হয়। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-স্বল্পতার কারণে শিশুর প্রতিপালন

এবং তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তার বৈষয়িক ও নৈতিক শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গর্ভধারণ, সন্তানপ্রসব এবং প্রতিপালনের এসকল জটিলতা ও পারিপার্শ্বিককতা এড়ানোর জন্য এবং দম্পতিকে সন্তানগ্রহণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে তোলার জন্য কুরআন-হাদীসের কিছু নির্দেশনা তুলে ধরছি-

এক. শারীরিক প্রস্তুতি

تَزَوَّجُوا الْوَدُودِ الْوَلُود

'তোমরা অধিক প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তানদাত্রী নারী বিয়ে করো।' (সুনানু আবি দাউদ: ২০৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান: ৪০৫৬)

প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো যে-নারী শুধু সন্তান দান করতে সক্ষমই নয়; বরং যার মধ্যে অধিক সন্তান দানের সম্ভাবনা রয়েছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অধিক সন্তানের সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে প্রথমে যে-দিকটি আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সেটি হচ্ছে নর-নারীর শারীরিক গঠন এবং যৌন-স্বাস্থ্য ও সুস্থতা।

কাজেই সন্তানগ্রহণের পূর্বে প্রতিটি দম্পতির; বিশেষত স্ত্রীর শারীরিক সক্ষমতা এবং যৌন-স্বাস্থ্য ও সুস্থতা-বিষয়ে সচেতন ও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে নিজেদের কনফিডেন্স ও আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট। তবে দু'জনের কোনো একজনের মধ্যে বিশেষ কোনো সংশয় কাজ করলে অভিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও করা যেতে পারে। এতে করে জানা যাবে,

আপনারা সন্তানগ্রহণের জন্য এবং আপনার স্ত্রী গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে কতটা প্রস্তুত।

কেননা, একটি স্বাস্থ্যবান সন্তান ও নিরাপদ জন্মপ্রক্রিয়ার জন্য একজন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মায়ের বিকল্প নেই। এজন্য সংশয় থাকলে গর্ভধারণের পূর্বে স্বাস্থ্য- পরীক্ষা করে শারীরিক অবস্থা জেনে নেওয়া দোষের কিছু নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট উপকারীও বটে। কারণ, এধরনের পরীক্ষা অনেক সময় গর্ভধারণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানকেও প্রভাবিত করে।

দুই. মানসিক প্রস্তুতি

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

'কোনো ব্যক্তি তার পরিবারের সঙ্গে সংসর্গে লিপ্ত হতে চাইলে সে যেন অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে এবং বলে, হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন। এই সংসর্গের মাধ্যমে আমাদেরকে যে-সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। এই দোয়া পড়ে সংসর্গ করার পর যদি তাদের কোনো সন্তান জন্মলাভ করে তবে শয়তান কখনোই তার অনিষ্ট করতে পারবে না।'(সহীহ বুখারীঃ৪৮৭৭, সুনানু আবি দাউদঃ১৮৪৪, জামি তিরমিযীঃ১০৭)

দ্বিতীয় হাদীসে সন্তানগ্রহণের পূর্বে দম্পতিকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। নিজেদের জন্য এবং অনাগত সন্তানের জন্য সার্বিক অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধ্যের অধীন এই প্রস্তুতি গ্রহণ করার শর্তে সুস্থ ও নিরাপদ নবজাতকের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই বলে আশ্বস্ত

করা হয়েছে যে, শয়তানের অশুভ দৃষ্টি বা প্ররোচনা তাকে কখনো কোনো অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।

বস্তুত ইসলাম হলো জীবনবাদী ধর্ম। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া-কলাপকে বিশেষ ইবাদাতে রূপ দেওয়া ইসলামের মজ্জাগত চেতনা। সন্তানগ্রহণ ও গ্রহণ-পূর্ব প্রস্তুতিও এই চেতনার আওতাভুক্ত। ইসলামের এই সদাজাগ্রত চেতনার কারণেই একজন মুসলিম তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঐচ্ছিক কোনো ঘটনাকে দুর্ঘটনা বা দুঃস্বপ্ন বলে বিশ্বাস করতে পারে না। গর্ভসঞ্চার হলে সে দিশেহারা বোধ করে না। সেটাকে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ও দুঃস্বপ্ন বলে অভিহিত করে না।

কাজেই ঈমানের পূর্ণতা ও অবিচলতার স্বার্থেই আপনাকে সন্তানগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হবে, এই মুহূর্তে আসলেই আপনারা সন্তান চান কি-না? সন্তানের প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও প্রস্তুতি আছে কি-না? আপনারা শিক্ষানবিশ হলে সন্তানগ্রহণ আপনাদের মৌলিক শিক্ষা বা জীবনযাত্রাকে শোচনীয় পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবে কি-না? গ্রহণযোগ্য কোনো কারণে আপনার সঙ্গী অপ্রস্তুত থাকলে এই মুহূর্তে সন্তানগ্রহণ করলে তার গুরুতর কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেবে কি-না? অথবা আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য বা বিচ্ছেদের মতো ঘটনা ঘটবে কি-না?

নিজেকে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলো করার পর যদি আপনি ইতিবাচক সাড়া পান এবং সন্তোষজনক উত্তর পান তবে বলা যায়, আপনি প্রকৃত অর্থেই সন্তানগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছেন। এখন আপনি নিশ্চিন্তে সন্তানগ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ আপনাকে আপনার স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর একটি সন্তান দান করুন।

তিন. আর্থিক প্রস্তুতি

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'তুমি তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেয়ো না' (সূরা কাহফ, আয়াত:৭৭)

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা পার্থিব জীবন নির্বাহের জন্য হালাল উপার্জনে ত্রুটি করো না। এটাকে তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র জ্ঞান করো না। ইবাদাত-বন্দেগিতে মগ্ন থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারটিকে একেবারে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না। অন্যের গলগ্রহ হয়ে থেকো না। কেননা, হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জনও একটি মহান ইবাদাত। স্তরভেদে অনেক সময় এই ইবাদাতটি ফরযের পর্যায়েও উন্নীত হয়।অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

'তোমরা বদান্যতা দেখাতে গিয়ে এতটা উদারতা প্রদর্শন করো না যে, পরে তোমাদেরকে নিঃস্ব হতে হয়। অনটনের জন্য আক্ষেপ করতে হয়। অন্যের গলগ্রহ হতে হয় এবং মানুষের তিরস্কার শুনতে হয়।'(সূরা ইসরা, আয়াত: ২৯)

উদ্ধৃত আয়াত দু'টির তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু সন্তানগ্রহণের জন্যই নয়; বরং অন্যান্য বৈষয়িক প্রয়োজনেও যথোপযুক্ত অর্থসঞ্চয় করা প্রশংসনীয়। দোষণীয় নয়। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি তো কিছুতেই নয়।

সুতরাং জীবনের ছোট-বড় আর-দশটি কাজের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হয়, ঠিক তেমনই সন্তানের প্রয়োজনেও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

অধিকন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, সার্বিক প্রস্তুতিগ্রহণ সত্ত্বেও কেবল অর্থনৈতিক সঙ্গতি না-থাকার কারণে সন্তানগ্রহণ থেকে বিরত থাকা বৈধ নয়। কেননা, যে-অনাগত সন্তানের জীবিকার চিন্তায় আপনি অস্থির হয়ে আছেন, মহান স্রষ্টা তার বিষয়টি অনেক আগেই ভেবে রেখেছেন। তার জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা বরাদ্দ রেখেছেন। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে-

وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

'পৃথিবীতে বিচরণশীল যত প্রাণী রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তাদের জীবিকার ভার গ্রহণ করেছেন। (সূরা হুদ, আয়াত: ০৬)

শুধু তা-ই নয়। তিনি আপনার সন্তান জন্মেরও কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তার ভাগ্য ও জীবিকা নির্ধারণ করে রেখেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

'মহান আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তার প্রতিটি সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।' (সহীহ মুসলিম :২৬৫৩, জামি তিরমিযী:২১৫৬)

কাজেই আপনি যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে সন্তানগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন তবে শুধু এই ভেবে সন্তানগ্রহণ থেকে বিরত থাকা সমীচীন হবে না যে, তাকে খাওয়াবে কে? পরাবে কে? আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর দেখভাল করবে কে? ইত্যাদি। কেননা, এগুলো তখন একান্তই আপনার ঈমানের দুর্বলতা ও খোদা-নির্ভরতার ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হবে।

চার.আল্লাহর ওপর ভরসা করা

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

'তোমরা চলমান দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে আমিই রিযিক দান করি। তাদেরকেও করবো।'(সূরা আনাম, আয়াত:১৫১)

পাঁচ.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

'তোমরা ভবিষ্যতে দরিদ্র হয়ে পড়ার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দান করি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা কবিরা গুনাহ। (সূরা ইসরা, আয়াত:৩১)

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে সকল দম্পতিকে একই সঙ্গে হুমকি ও অভয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা চলমান অর্থনৈতিক সংকট অথবা ভবিষ্যতে দরিদ্র হয়ে পড়ার ভয়ে ভ্রূণ-সন্তান অথবা ভূমিষ্ঠ সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে যেমন আমি রিযিক দান করি তেমনই তাদেরকেও দান করবো। তাদেরকে হত্যা করলে তোমরা কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে এবং একারণে তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অধিকন্তু শেষোক্ত আয়াতে -نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم অর্থাৎ, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দান করি-রিযিকের বর্ণনার ক্ষেত্রে শিশু-সন্তানদেরকে মা-বাবার ওপর অগ্রবর্তী করে অতিসূক্ষ্মভাবে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দম্পতিকে রিযিক দানের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ প্রথমেই অনাগত ও নবজাতক শিশুর কথা চিন্তা করেন। এরপর তাদের উসিলায় তিনি তাদের মা-বাবা ও পরিবারের অন্য লোকদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। অন্যথায় তিনি হয়তো মা-বাবা অথবা পরিবারের লোকদের জীবিকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করতেন-ই না।

কাজেই সন্তানদেরকে অর্থনৈতিক অনটনের কারণ হিসেবে বিবেচনা না-করে সুখ, সচ্ছলতা ও সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে বিবেচনা করলে সন্তান আপনার জীবনে সুখ ও সচ্ছলতা নিয়ে আগমন করবে। সুতরাং এখনই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলুন।
অর্থনীতিকে সন্তানগ্রহণের ভিত্তি বানানোর প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসুন। সন্তান নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব দিন। এরপর সুখ ও সচ্ছলতার উপায় হিসেবে সন্তানগ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে সন্তান ও সম্পদের সুখ ও শোভাময় জীবন দান করুন। কুরআনের ভাষায়-

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা বিশেষ।' (সূরা কাহফ, আয়াত:৪৬)

ঘরে ঈমানি পরিবেশ তৈরি করা

ঘরকে আল্লাহর যিকিরের স্থানে পরিণত করা।

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

আবু মূসা রাযি. সূত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না, এই দুই ঘরের উপমা হলো, জীবিত এবং মৃতের মতো। (সহীহ মুসলিম: ১/৫৩৯, হা. নং ৭৭৯)

সুতরাং অবশ্যই ঘরকে আল্লাহ তাআলার যিকিরের স্থানে পরিণত করতে হবে। হতে পারে এই যিকির মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করে, জোরে জোরে নামাজের মাধ্যমে অথবা কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের মাধ্যমে এবং হতে পারে ইলমি আলোচনার মাধ্যমে কিংবা বিভিন্ন ইসলামি বই তা'লীমের মাধ্যমে।

উল্লিখিত হাদীস মতে আল্লাহর যিকির না থাকার কারণে বর্তমানে কত মুসলিম ঘর যে মৃত তার কোনো হিসেব নেই! আর ঐ সকল ঘরের কী অবস্থা- যেখানে আল্লাহর যিকির না হয়ে শয়তানের বাঁশি বাজে, গান- বাজনা হয়, যেখানে গীবত-শেকায়াত, অপবাদ-চোগলখুরি হতে থাকে!

ঐ ঘরের কী অবস্থা, যা গুনাহ ও খারাপ কাজে পূর্ণ থকে? যেখানে হারাম মেলামেশা হয়? বেপর্দার সাথে নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশী গায়রে মাহরামদের অবাধ যাতায়াত হয়? যে ঘরের অবস্থা এমন, তাতে ফেরেশতা কীভাবে প্রবেশ করবে! সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে তোমাদের ঘরকে জীবিত করে তুলো।

হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ

প্রথমত সকল পিতা-মাতাকে এ কথা ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত এবং হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, সন্তানের হেদায়েত ও সঠিক পথ প্রদর্শনের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি যাকে সঠিক পথ দেখান কেবল সে-ই পায় সঠিক পথের দিশা। এছাড়া দ্বিতীয় আর কারোর শক্তি ও ক্ষমতা নেই তাকে সঠিক পথ দেখানোর।
সন্তানকে হেদায়েত ও সঠিক পথ প্রদর্শনের ক্ষমতা পিতা-মাতার নেই এ কথা সত্য; তবে এক্ষেত্রে পিতা-মাতার কিছু অবশ্যপালনীয় কর্তব্য রয়েছে। তা হলো, পিতা-মাতা সে সমস্ত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করবেন যা করলে সন্তান হেদায়েত ও সঠিক পথের দিশা পাবে।

পিতা-মাতার জন্য এটি জরুরি বিধান। তারা সন্তানকে সঠিক পথ প্রদর্শন ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সন্তান প্রতিপালনে যে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অনুসরণ করবে।

কাউকে হেদায়েত ও সঠিক পথ প্রদর্শনের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলার। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেবেন, কেবল সে-ই হেদায়েত পাবে। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।'(সুরা আরাফ: ১৭৮)

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

'নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান তাকে হেদায়েত দেন।। সুতরাং (হে নবি) আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে।"(সুরা ফাতির: ৮)

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

'আমি চাইলে প্রত্যেককে হেদায়েত দিতে পারতাম; কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানুষ সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।'(সুরা সাজদাহ: ১৩)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

' তোমার প্রভু যদি চাইতেন, পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, সকলে ঈমান গ্রহণ করত সমবেতভাবে। তুমি কি ঈমান আনার জন্য মানুষকে জবরদস্তি করবে?'(সুরা ইউনুস: ৯৯)

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করেন।'(সুরা নূর: ৪৬)

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

'আপনি বলে দিন, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হেদায়েত দিতেন। '(সুরা আনআম: ১৪৯)

হজরত নুহ আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছেন,

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'আমি তোমাদের নসিহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চান। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তার কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।'(সুরা হুদ: ৩৪)

হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম দোলনাতে থাকা অবস্থায় কী বলেছেন তা পড়ুন মন নিবিষ্ট করে,

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

'আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে বানিয়েছেন নবি। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে, আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। (সুরা মারয়াম: ৩০-৩৩)

আরেকটি আয়াত দেখুন, যেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

'আমি মরিয়ম-পুত্র ও তার মাতাকে একটি নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানিবিশিষ্ট টিলায়।'(সুরা মুমিনুন: ৫০)

কে ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাতাকে নিদর্শন দিয়েছেন, যার আলো ধরে তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছেন?

সঠিক পথের দিশা কে দিতে পারেন মানুষকে?
নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে কার ভয় দেখিয়েছেন?

তিনি আল্লাহ। একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা রয়েছে কাউকে হেদায়েত দেওয়া না দেওয়ার। তিনিই আমাদের একমাত্র রব। আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নবি হিসেবে পেয়ে পরম সন্তুষ্ট!

কুরআনে আল্লাহ একজন অবাধ্য ছেলের বিবরণ দিয়েছেন, যে তার পিতা-মাতার সাথে বিরূপ আচরণ করেছে। ফলে আল্লাহ তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছেন। সে তার পিতা-মাতাকে যা বলেছিল তা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, ধিক্ তোমাদের, তোমরা কি আমাকে এই সংবাদ দাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়েছে?

তখন পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার। তুমি বিশ্বাস স্থাপন করো। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের

উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের পূর্বে যেসব জিন ও মানুষ গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (সুরা আহকাফ: ১৭-১৮)

এই অবাধ্য সন্তানকে হেদায়েতের পথ থেকে সরিয়ে কে ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করেছে? কে পথহারা করেছে তাকে? তিনি আল্লাহ। হেদায়েত দেওয়া ও ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করার তিনিই একমাত্র মালিক। তিনি মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রা।

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন। হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তান-সন্ততিদের সুপথে পরিচালিত করুন। আমাদের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজন থেকে চক্ষু শীতলকারী সন্তানাদি দান করুন এবং আমাদেরকে বানান মুত্তাকিদের ইমাম।

নেককার সন্তান চেয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করা

আপনি যখন জানতে পারলেন এবং এর ওপর অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলেন যে, হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তখন আপনার অপরিহার্য করণীয় হচ্ছে, বেশি বেশি আল্লাহর নিকট নেককার ও হেদায়েতপ্রাপ্ত সন্তান লাভের জন্য দুআ করা। আপনার সন্তান যেন সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার, ভ্রষ্টতা এবং মানুষ ও জিন শয়তানের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে সে জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করা। পূর্ববর্তী নবি-রাসুল ও নেককার ব্যক্তিগণ তা-ই করতেন। তারা অধিক পরিমাণে

আল্লাহর নিকট নেককার সন্তান-সন্ততির জন্য দুআ করতেন। কুরআন ও হাদিসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর নেককার ও প্রিয় বান্দারা এই বলে বেশি বেশি দুআ করতেন,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্যে আদর্শ বানাও।'(সূরা ফুরকান: ৭৩)

হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম নেককার সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করে বলেন,

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

'আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। '(সুরা মারয়াম: ৫-৬)

তিনি আরও দুআ করেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

'হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। '৩৪

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর পুত্র হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম দুআ করেন,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً

'হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করো।'(সূরা বাকারা:১২৮)

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আরও বলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

'হে আমার প্রভু! আমাকে একজন নেককার সন্তান দান করো। '(সূরা সাফফাত:১০০)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামাজ কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের দুআ কবুল করে নাও।'(সূরা ইবরাহিম :৪০)

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

'আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখো।'(সূরা ইবরাহিম:৩৫)

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন চল্লিশ বছরে উপনীত হন তখন দুআ করে বলেন,

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করো, যাতে আমি তোমার ' নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো।'(সূরা আহকাফ:১৫)

আল্লাহ তাআলা সন্তান কামনায় পূর্বেকার নবি-রাসুলদের এ সমস্ত দুআ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এর মাঝে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। সকল নারী ও পুরুষেরই হৃদয়ের কামনা থাকে সন্তানের পিতা-মাতা হবার। প্রতিটি মানুষের অন্তরে এই বাসনা আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নেককার ও আদর্শ সন্তান প্রত্যাশী নারী- পুরুষদের উচিত কুরআনে বর্ণিত এ সমস্ত দুআ বেশি বেশি পড়া।

নিজ সন্তান ও অন্যদের জন্য রাসুলের দুআ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সন্তান এবং মুসলমানের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন। একবার হাসান ইবনে আলি (রা.)-এর ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “হে আল্লাহ! আমি হাসানকে ভালোবাসি, আপনিও ভালোবাসুন হাসানকে।”(সহিহ বুখারি: ৩৭৪৯, সহিহ মুসলিম: ২৪২২)

সহিহ বুখারির অন্য হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) ও হাসান ইবনে আলি (রা.)-এর হাত ধরে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি এদের দুজনকে ভালোবাসি, আপনিও ভালোবাসুন তাদের।'(সহিহ বুখারি: ৩৭৪৭, ৩৭৩৫)

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট যখন রাসুলের দৌহিত্র হুসাইন ইবনে আলি (রা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি ইরাকবাসীর ওপর অভিসম্পাত করে বললেন, 'তারা হুসাইনকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। তারা হুসাইনের সাথে প্রতারণা করেছে, তাকে লাঞ্ছিত করেছে। এর জন্য আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। আমার মনে আছে, একদিন ফাতেমা একটি পাত্রে করে সারিদ বানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমাকে বললেন, তোমার চাচাতো ভাই (আলি) কোথায়? ফাতেমা বললেন, আলি বাড়িতে আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও তাকে ও তার দুই সন্তানকে নিয়ে আসো। সে মতে ফাতেমা গিয়ে আলি এবং হাসান ও হুসাইনকে নিয়ে এলেন। আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের সেই চাদর যা আমরা মদিনায় ঘুমের সময় বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতাম, তা দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলকে মুড়িয়ে নিলেন। অতঃপর বামহাতে চাদরের প্রান্ত ধরে ডানহাত উঁচু করে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! তারা আমার পরিবার। তাদের সকল পঙ্কিলতা দূর করে আপনি তাদের পূত-পবিত্র বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! তারা আমার পরিবার। তাদের সকল পঙ্কিলতা দূর করে আপনি তাদের পূত-পবিত্র বানিয়ে দিন। তা দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি আপনার পরিবারভুক্ত নই? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি আমার পরিবারভুক্ত, তুমিও চাদরের ভেতর এসো। আমি তখন চাদরের ভেতর প্রবেশ করি। '(মুসনাদে আহমদ: ২৬৫৫০)

সন্তানের জন্য কখনো বদ-দুআ না করা

সন্তানের জন্য পিতা-মাতা কখনোই বদ-দুআ করবে না। এমনটা থেকে বিশেষভাবে বিরত থাকবে। কেননা, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ যেমন আল্লাহ কবুল করেন,

তেমনি সন্তানের জন্য পিতা-মাতার বদ-দুআও কবুল হয়ে যেতে পারে। এর পরিণাম সন্তানের জন্য ঘোরতর অকল্যাণ বহে আনে। এই ব্যাপারে অনেক পিতা- মাতাই উদাসীন। দেখা যায় সামান্য কিছু হলেই তারা সন্তানের জন্য বদ-দুআ করে ফেলে। এমনটা করবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানদের জন্য বদু-দুআ করতে পিতা- মাতাদের নিষেধ করেছেন। জাবির (রা.) বলেন, একবার আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বুওয়াত প্রান্তরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তিনি মাজদি ইবনে আমর আল জুহানি কাফিরকে খোঁজ করছিলেন। এ সফরে একটি উটে আমাদের পাঁচজন, ছয়জন, সাতজন ব্যক্তি পালাক্রমে আরোহণ করত। তারপর এক আনসারি ব্যক্তির আরোহণের পালা এলে সে তার উটটিকে বসিয়ে এর ওপর আরোহণ করল এবং তাকে চালাল। চলমান অবস্থায় উটটি তার ওপর কিছু ধুলাবালি উড়াল। ফলে সে রাগতস্বরে বলে উঠল, আল্লাহ তোমার প্রতি অভিসম্পাত করুন। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ লোকটি কে যে তার উষ্ট্রের প্রতি অভিসম্পাত করল? সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এর থেকে নেমে যাও। আর অভিশপ্ত উটটি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। তোমরা তোমাদের সন্তানদের ওপর এবং নিজের ধন-সম্পদের ওপর বদ-দুআ করবে না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এমন মুহূর্তে বদ-দুআ করলে যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হয় এবং তা কবুল হয়। (সহীহ মুসলিমঃ৩০০৯)

ঈমান ও আক্বীদা রোপন করা

আক্বীদা ও ঈমান এমন দুইটি মূলভিত্তি যার উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য সকল আমল প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং যখন কোন বিষয়ের ভিত্তি শুদ্ধ ও সুদৃঢ় হয় তখন তার ফলাফল ভাল ও উত্তম প্রতিফল পাওয়া যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ

طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) (تُؤْتِي

أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ

اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦) [إبراهيم[٢٤ - ٢٦ :

"তুমি কি দেখ না কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায় যার মূল সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর শাখা-প্রশাখা আকাশপানে বিস্তৃত। তার প্রতিপালকের হুকুমে তা সব সময় ফল দান করে। মানুষদের জন্য আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আর অপবিত্র বাক্যের উপমা নিকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যাকে মাটির উপর থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোন স্থিতি নেই।"(সূরা ইবরাহীম-১৪:২৪-২৬)

সুতরাং যদি কোন গাছের মূল ভিত্তি কেটে দেওয়া হয় তাহলে সে গাছ মারা যাবে। অনুরূপভাবে দ্বীন যদি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সে দ্বীন দ্বারাও কোন উপকার আসবে না। তাই বলা যায় দ্বীনের মধ্যে তাওহীদের মর্যাদা হলো গাছের শিকড় ও ভবনের ভিত্তির মতই। অর্থাৎ একটি বৃক্ষের শিকড় কেটে দেওয়া হলে যেমন সে বৃক্ষের কোন মূল্য থাকে না। অনুরূপভাবে একটি ভবনের ভিত্তি না থাকলে যেমন সে

ভবন স্থির থাকতে পারে না, তেমনিভাবে দ্বীনের মধ্যে তাওহীদ না থাকলে সে দ্বীন পালনে কোন উপকার আসবে না।

আর এজন্যই শিশুকাল থেকেই শিশুদের অন্তরে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও ঈমান বদ্ধমূল করার জন্য আল্লাহর ওহীর নির্দেশনামূলক প্রচুর বর্ণনা রয়েছে। যেমনভাবে লুকমান হাকীম(রঃ) তাঁর প্রিয় সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার প্রাক্কালে খুবই গুরুত্বের সাথে তাদের মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়েছেন। বরং তিনি সন্তানদের যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার প্রথম নির্দেশেই ছিল শিরক বর্জন করে সর্বদা তাওহীদের উপর অবিচল থাকতে। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان[١٣ :

যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম'।(সূরা লুকমান-৩১:১৩)

তিনি প্রিয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে সূচনায় কঠিনভাবে শিরক ও শিরকের ভয়াবহতা থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা শিরক হলো সকল পাপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ও নিকৃষ্ট পাপ। শিরকের কারণে ব্যক্তির সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

আর শিরক বলতে বুঝায়, আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থাপন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে বর্ণনা করেন, তারা যখন কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তারা নিজেদেরকে হতাশা ও লজ্জিত মনে করে বলতে থাকবে,

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨) [الشعراء[٩٨ ، ٩٧ :

আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম' 'যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম'।(সূরা শুআরা:৯৭-৯৮)

আর যখন লুকমান (র.) তাঁর প্রিয় সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে আল্লাহ সবকিছু যে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং প্রত্যেক জিনিস তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন,
يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ [لقمان: ١٦]

হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় আর তা থাকে পাথরের ভিতরে অথবা আকাশে অথবা যমীনের নীচে, আল্লাহ তাকে এনে হাজির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা লুকমান:১৬)

সুতরাং এখানে পিতা-মাতাকে গভীরভাবে সতর্ক ও সবাধান করা হয়েছে যে, প্রত্যেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের প্রতিপালনের সময় যেন তাদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নজরদারি ও তাঁর তত্ত্বাবধানেই রয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল বিষয়ে অবহিত রয়েছেন। সন্তানদের অন্তরে এ আক্বীদা ও বিশ্বাস তৈরি করতে পারলেই তাদের প্রতি ইহসান ও দয়ার মর্যাদা আরো ত্বরান্বিত ও সুদৃঢ় হবে। এছাড়াও তারা তাদের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তা'আলার নজরদারি ও পর্যবেক্ষণের কথা স্মরণ করে কর্মে উদ্যত হবে। বিশেষকরে কর্ম-প্রণালীর বিস্তৃতি ঘটা এবং শারীরিক বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও ঝুঁকির প্রাক্কালের সময়েও আল্লাহর নজরদারিতার বিষয়ে খেয়াল রাখবে।

আর অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই আক্বীদা শিশু সন্তানদের অন্তরে সৃষ্টি করার বিষয়ে ব্যাপকভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

ইবনু আব্বাস (হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন, হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি- নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর।

আর জেনে রাখো, যদি সকল উন্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। আবূ ঈসা (র:) বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

(সহীহ আত-তিরমিযী, হা:২৫১৬; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাঃ ৫৩০২)

সন্তান প্রতিপালনের সাথে ঈমান, আকীদা, ইহসানের সম্পর্ক কী?

আলোচ্য বিষয়ের সাথে আমাদের কোর্সের সম্পর্ক হলো, পিতা-মাতার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সন্তানকে মুসলিম হিসেবে বড় করা নয়, বরং তাদের অন্তরে সুদৃঢ় আকীদা ও ঈমানের পরিচর্যা করা। যদি কোনো মুসলিম পরিবার কেবল শিশুদের বাহ্যিক ও ব্যবহারিক দ্বীনি বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ প্রদান করে, কিন্তু আকীদার প্রতি উদাসীন থাকে-তবে সেই প্রচেষ্টার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর দৃষ্টান্ত একটি দুর্বল কাঠামোর উপরে উঁচু ভবন নির্মাণের অনুরূপ। সেই ভবন ধ্বসে পড়বে। কেবল দ্বীনের ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলে শিশুরা শিখবে কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়, সিয়াম পালন করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো পালন করার প্রতি তাদের অন্তরে কোনো আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে না। তারা হয়তো নিজের পরিবার, পিতা-মাতা বা মুসলিম বন্ধুদের খুশি করার জন্য সেগুলো পালন করবে, কিন্তু সেই আমল দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

মুসলিম হওয়ার প্রকৃত অর্থ প্রথমে অনুধাবন করা জরুরি। কীভাবে একজন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে এবং কীভাবে ইহসানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তা অনুধাবন করা জরুরি। শিশুর জন্ম থেকেই তার অন্তরে ঈমানের চাষাবাদ করার কাজ পিতা-মাতাকে শুরু করতে হবে। কীভাবে ইখলাসের সাথে অন্তরে বিশ্বাস এবং বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হয় তা সন্তানকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। শিশুদের শেখাতে হবে কীভাবে আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হয়। কীভাবে ভালোবাসা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হয়। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যেন অন্য যে-কোনো ব্যক্তি বা দুনিয়ার যে-কোনো বিষয়ের থেকে অধিক হয়। আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

*... কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়।' (সূরা বাকারাহ, ২: ১৬৫)

একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে জানতে চাইলেন, 'কিয়ামাত কখন হবে? রাসূল (ﷺ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সেই দিনের জন্যে তুমি কি প্রস্তুতি-গ্রহণ করেছ? লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সঙ্গেই থাকবে।

শিশুদের অন্তরে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে এবং কুফর ও নিফাকের (দ্বিমুখী আচরণ, মুনাফেকির) প্রতি ঘৃণা তৈরি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়-

(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়

(২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোনো বান্দাকে মুহব্বত করে এবং

(৩) আল্লাহ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।(সহীহ বুখারী:১৬)

তাদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য-লাভ ও পুরস্কারের আশা থাকতে হবে এবং শাস্তি ও অসন্তুষ্টির ভয় রাখতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানকে সত্যিকারের মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন, যারা ভবিষ্যতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বার্তা বহন করবে। একবার ভেবে দেখুন, যদি এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে একশ কোটি মুমিন থাকত তা হলে পৃথিবীর চেহারা কতটা বদলে যেত!

এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিন, এই ফর্মুলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'বিল্ডিং ব্লক' হলো আকীদা যা ঈমানের ভিত্তি। ঈমান গড়ে ওঠে আল্লাহর বিষয়ে জ্ঞান এবং একত্ববাদের উপর, তাঁর নাম ও গুণাবলীর উপর, তাঁর শক্তি এবং মহিমা, ক্ষমা এবং রহমতের

উপর, তাঁর ইচ্ছা এবং তাকদীরের বিধান ও নবি রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসের উপর। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হতে সঠিক এবং সুদৃঢ় আকীদার গুরুত্বের শেষ নেই, কেননা বিশ্বাস থেকেই কাজের সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামদের ইসলামের ব্যবহারিক বিষয় শেখানোর আগে দীর্ঘ তেরো বছর ধরে আকীদা শিখিয়েছেন। ঈমানকে সুদৃঢ় করা এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া নিশ্চিত করার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে। যদি পিতা-মাতা সন্তানদের কেবলমাত্র বিশুদ্ধ আকীদার শিক্ষা প্রদান করে এবং বাহ্যিক আমলের কিছুই না শেখায়, তবুও সেই সন্তান জান্নাতে যাওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে তাদের চেয়ে-যারা অনেক সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, দান খয়রাত করে, কিন্তু কবর-মাজার পূজা তথা শিরক করে।

একজন ব্যক্তির মধ্যে সত্য-মিথ্যা পৃথক করার যোগ্যতা (বিবেক) বিকাশের জন্য এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি সঠিক বিশ্বাস থাকা জরুরি। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং সত্য-মিথ্যা পৃথক করার ক্ষমতা কেমন সেই ভিত্তিতেই একজন ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতে বৈধ ও সঠিক কাজটা করতে পারে। সে স্বেচ্ছায় উত্তম বিষয় নির্বাচন করে, জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করতে হয় না।

এ কারণে যে-শিশুর মধ্যে ঈমান এবং তাকওয়া বিকশিত হয়েছে তাকে প্রতিপালন করা অনেক সহজ। যে শিশু স্বেচ্ছায় আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে ভালো-মন্দ নির্বাচন করতে পারে তাকে বাইরে থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কাজের পুরস্কারের দিকে মনোযোগ প্রদান করা হয়, ভালো আচরণের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ আচরণের জন্য শাস্তি প্রদানকে উৎসাহিত করা হয়। এই টেকনিকগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে, কিন্তু এগুলোকে সন্তান প্রতিপালনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি পিতা-মাতা সন্তানের অভ্যন্তরীণ (ঈমানি) শক্তি বিকাশে সহায়তা প্রদান করে, তবে এই ধরনের টেকনিকের খুব বেশি

প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় মোটেও প্রয়োজন হয় না। ঈমান বিকাশের দিকে প্রধান মনোযোগ দিতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে সন্তুষ্টি এবং পুরস্কার অর্জনের দিকে, মানুষের মূল্যায়নের দিকে নয়। শিশুর অন্তরে গভীরভাবে এ বাস্তবতা অনুধাবন করাতে হবে যে মানুষের প্রশংসা, পুরস্কার বা যে-কোনো দুনিয়াবি বস্তুগত কিংবা সামাজিক পুরস্কারের থেকেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন অনেক অনেক উত্তম। পিতা-মাতা সন্তানের অন্তরে ঈমানের পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটাবেন যেন তারা সফলতা অর্জন করতে পারে। শুধুমাত্র দুনিয়াতে নয়, বরং আখিরাতের সফলতা হলো প্রধান সফলতা। এ বিষয়টি শিশুদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে দিতে হবে। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতা সম্পদ বা ক্ষমতার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় না, বরং সফলতা পরিমাপ করা হয় আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং আখিরাতের জীবনে জান্নাত অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছেন,

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

'কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণা। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।' (সূরা আল ইমরান, ৩: ১৯৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم ۝

'আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহা সফলতা।' (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৯)

নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন।

সন্তানের সুরক্ষা ও প্রতিপালনে প্রাথমিক করণীয়

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে প্রথম সাক্ষাতে করণীয়

আমরা মনে করি জন্মগ্রহণের পর সন্তানের প্রতিপালন শুরু হয়। না, বরং পিতা- মাতার বিয়ের পর প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই সন্তানের প্রতিপালন ও সুরক্ষার ধাপ শুরু হয়ে যায়। এই পর্যায়ে আমরা সে বিষয়গুলো দলিল-প্রমাণসহ জানব।

বিয়ের পর স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হবে তখনের শরিয়তসিদ্ধ ও সুন্নত কিছু বিষয় রয়েছে, যা যথাযথ পালন করলে অনাগত সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিষয়গুলো আমাদের শিখিয়ে গেছেন। বিয়ের পর স্বামী যখন প্রথম স্ত্রীর সাক্ষাতে বাসরঘরে প্রবেশ করবে তখন স্ত্রীর কপালে হাত রেখে হাদিসে বর্ণিত এই দুআ পড়বে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। '(সুনানে আবু দাউদ: ২১৬০)

অতঃপর যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তখন প্রতিবার সহবাসের পূর্বে এই দুআ পড়বে,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যা আমাদেরকে (সন্তান হিসেবে) দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখো। '(সহিহ বুখারি: ১৪১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে উক্ত দুআ পড়ে, তাহলে এই সহবাসের দ্বারা জন্ম নেওয়া সন্তানের কোনো ক্ষতি শয়তান করতে পারবে না।'(সহিহ বুখারি: ১৪১)

সন্তান জন্মগ্রহণের সময় করণীয়

বিয়ের পর নিয়মমাফিক স্বামী ও স্ত্রীর দেখাসাক্ষাৎ হবে। একসময় ঘর আলো করে আগমন করবে সন্তান। সন্তান পুত্র হোক চাই কন্যা, আল্লাহর দেওয়া রিজিকের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। সন্তান আল্লাহর দেওয়া বিরাট নেয়ামত। কাউকে তিনি ছেলে দেন, কাউকে দেন কন্যা। দুনিয়াতে তাদের রিজিকও তিনিই দেবেন। ইরশাদ হয়েছে,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তাআলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। '(সুরা শুরা: ৪৯-৫০)

ছেলে কিংবা মেয়ে, কার মাঝে উপকার ও কল্যাণ রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। মানুষ কখনো পুত্রসন্তানের কামনা করে, আবার কখনো কন্যাসন্তানের কামনা করে। কিন্তু কোনটির মাঝে উপকার ও কল্যাণ নিহিত আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই আল্লাহর সিদ্ধান্তে মুমিনের সন্তুষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। ভালো-মন্দ আর কল্যাণ-অকল্যাণের ভবিষ্যৎ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

'তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।(সুরা নিসা: ১১)

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ

তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।'(সুরা বাকারা: ২১৬)

আজকাল অনেকে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানের প্রতি অধিক আগ্রহী। প্রথম সন্তান কন্যা হলে বা একাধিক কন্যা হলে তাদের অন্তর ব্যথিত হয়ে পড়ে। চেহারা কালো হয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে দ্বিধা লাগে।এমনটা কখনোই কাম্য নয়। আল্লাহর সিদ্ধান্তকে কল্যাণকর মনে করতে হবে এবং এতেই সন্তুষ্ট হতে হবে। কত কন্যাসন্তান রয়েছে যাদের কারণে তাদের পিতা-মাতা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হয়েছে। আবার কত পুত্রসন্তান রয়েছে যাদের কারণে তাদের পিতা-মাতা হয়েছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আল্লাহ আমাদেরকে এমন পুত্রসন্তান থেকে নিরাপদ রাখুন, আমিন! মারয়াম একজন কন্যা ছিলেন, যিনি নাবি বংশের ছিলেন এবং তার থেকে একজন শ্রেষ্ঠ নবির জন্ম হয়েছে। অনুরূপভাবে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ একজন কন্যা ছিলেন, যাকে জান্নাতের রমণীকুলের নেতা মনোনতী করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হজরত নুহ আলাইহিস সালামের পুত্র ছিল কাফের। এবার আপনি মারয়াম ও ফাতেমার সাথে নুহ আলাইহিস সালামের পুত্রের তুলনা করুন এবং ভেবে দেখুন আল্লাহ কার মাঝে কল্যাণ রেখেছেন।

কাফের মুরতাদদের প্রচার-প্রচারণা ও বস্তুবাদী দুনিয়ার প্রভাবে অনেকের মাঝে কন্যাসন্তানের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা গড়ে উঠেছে। এমন জঘন্য ও কুৎসিত ধ্যানধারণা একজন মুমিনের হৃদয়ে কিছুতেই তৈরি হওয়া উচিত নয়। এটা ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের চিন্তা। ইসলাম এসে তা দূর করে দিয়েছে। উপরন্তু কন্যাসন্তান প্রতিপালনের আলাদা মহিমা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মহিলা তার দুটি কন্যাসন্তান সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইল। আমার কাছে একটি খুরমা ব্যতীত আর কিছুই সে পেল না। আমি তাকে দুটি খেজুর দিলাম। মহিলা তার দুই মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিল।

তারপর সে উঠে বের হয়ে গেল। এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। আমি বিষয়টি জানালাম তাঁকে। তখন তিনি বললেন, যাকে এসব কন্যাসন্তান দিয়ে কোনো পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।'(সহিহ বুখারি: ৫৯৯৫)

সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক অসহায় স্ত্রী তার দুটি মেয়েসন্তান-সহ আমার নিকট এল। আমি তাদের তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে দুই মেয়ের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাওয়ার জন্য মুখে তুলল। যখনই স্ত্রী লোকটি খেজুর তার মুখে দিতে নিল সে মুহূর্তে মেয়েরা এ খেজুরটিও খেতে চাইল। সে তখন নিজে খাবার জন্যে যে খেজুরটি মুখে তুলেছিল সেটি তাদের উভয়ের মাঝে বণ্টন করে দিল। তার এ আচরণ আমাকে আশ্চর্য করে দিল। পরে আমি সে যা করেছে তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা এ কারণে তার জন্যে জান্নাত আবশ্যক করে দিয়েছেন অথবা তিনি তাকে এ কারণে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়েছেন। (সহিহ মুসলিম ;২৬৩০)

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি মেয়েসন্তানকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিনে সে ও আমি এমন পাশাপাশি অবস্থায় থাকব, এ বলে তিনি তার হাতের আঙুলগুলো মিলিয়ে দিলেন। (সহিহ মুসলিম;২৬৩১)

অনেক নবি-রাসুলকে আল্লাহ তাআলা কেবল পুত্রসন্তান দিয়েছেন, কন্যাসন্তান দেননি। অনেক নবি-রাসুলকে কেবল কন্যাসন্তান দিয়েছেন, পুত্রসন্তান দেননি। কাউকে কোনো সন্তানই দেননি, না পুত্র আর না কন্যা। আবার কাউকে দিয়েছেন উভয়টি। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কোনো কন্যাসন্তান ছিল না, পুত্র ছিল কেবল। লুত

আলাইহিস সালামের কোনো পুত্র ছিল না, কন্যা ছিল শুধু। আর আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ও কন্যা উভয়টি ছিল। কিন্তু পুত্রদের কেউ দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি। কৈশোর অতিক্রম করার আগেই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। বড় হয়েছেন কেবল কন্যারা।

সুতরাং সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা, উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত ও রিজিক। আল্লাহ যাকে খুশি কন্যা দেন, যাকে খুশি পুত্র দেন, যাকে খুশি উভয়টি দেন আবার যাকে খুশি কিছুই দেননি। সর্বাবস্থায় আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা চাই এবং আল্লাহর ইচ্ছার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোক্ত করা আবশ্যক।

গর্ভবতী মায়ের পড়াশোনা

একটি শিশু এসে একটি নারীর জীবনকে ধন্য করে তোলে। একজন নারী আর এক জীবনে পদার্পণ করেন মাতৃস্নেহ নিয়ে। প্রকৃত মা সেই, যে সঠিকভাবে সন্তান প্রতিপালন করেন। মা হওয়ার জন্য কেবল জন্মদাত্রী হওয়াই যথেষ্ট নয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন একজন নারী প্রেগন্যান্ট হন তখন তিনি এই বিষয়ের উপর কোন প্রকার পড়াশোনা করেন না। কিন্তু খুদর খাওয়া-দাওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক। আমাদের দেশে দশে প্রেগন্যান্ট মা শুধু নিয়েই চিন্তিত থাকেন আর অন্য কোন বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। প্রেগন্যান্ট মহিলাদের জন্য রকম কোর্স রয়েছে। এই বিষয়ের উপর বাজারে অনেক বই এবং ডিভিড়ি রাকওয়া যায় যা প্রেগন্যান্ট হওয়ার আগ থেকেই পড়া ও দেখা বেঁকে করা উচিত। এছাড়া ইন্টারনেটে এ বিষয়ে প্রচুর সাইট রয়েছে যেখান থেকে ঘরে বসেও পড়াশোনা করা যেতে পারে। এতো গেল একজন সাধারণ মায়ের কথা।

কিন্তু একজন মুসলিম মায়ের দায়িত্ব অন্যান্য মায়েদের চেয়ে আরো অনেক। বেশী। ঐসকল পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি আরো অতিরিক্ত পড়াশোনা করবেন কিভাবে তার সন্তানকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবেন, কিভাবে তার সন্তানের অন্তরে সঠিক দ্বীনের আলো প্রবেশ করবে। সেজন্য প্রয়োজন। ইসলামী শিশু সাহিত্য পড়া, আল কুরআনের তাফসীর পড়া, রসূল-এর জীবনী পড়া, সাহাবাদের জীবনী পড়া। এছাড়া এখন প্রচুর ইসলামিক ডিভিডি পাওয়া যায় এবং ইন্টারনেট থেকেও আমরা অনেক ভিডিও দেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। প্রেগন্যান্ট অবস্থায় মায়েরা সাধারণত হাতে অনেক সময় পান বা চাকুরীরত মায়েরা সন্তান জন্মের পর সাধারণত বাসাতেই থাকেন। এই সময়ে মায়েরা ইসলামের উপর পড়াশুনা করে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এতে অনেক মানসিক শান্তিও পেতে পারেন।

সন্তান জন্মের পূর্বে মায়ের সতর্কতা

অতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাস্তবে দেখা গেছে যে প্রেগন্যান্ট মায়েরা নয় মাস দশ দিন (৪০ সপ্তাহ) সময় কাটায় অনৈসলামী কর্মকান্ড করেন। সন্তান আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে নিয়ামতস্বরূপ, এ জন্য আমাদের সবসময় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা কিন্তু আমরা করি তার উল্টোটা। আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাজ হারাম করেছেন এবং যেসকল কাজ করা পছন্দ করেন না সেগুলো আমরা প্রেগন্যান্ট অবস্থায় করে থাকি। তখন অবসর সময় কাটানোর জন্য দেখা গেছে অনেক মায়েরাই রিমোট হাতে টিভির সামনে বসে সময় কাটায়, অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, হিন্দি সিনেমা, ইত্যাদি উপভোগ করে থাকেন।

আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি যে, পেটে যে সন্তান আছে সে সবই শুনতে পায় এবং মায়ের কাজকর্ম বুঝতে পারে। একজন মা যদি ঠিক মতো পাঁচ

ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন, এই সময় ভাল বই পড়েন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, কুরআন তিলাওয়াত শুনেন, কুরআনের তরজমা শুনেন, হাদীস পড়েন, কুরআনের তাফসীর পড়েন, ইসলামিক লেকচার শুনেন এবং দেখেন তাহলে সেই পেটের সন্তানের উপর কেমন শুভ প্রভাব পড়বে? আর তার ঠিক উল্টোটা যদি কোন মা করেন, ইসলাম যার অনুমোদন দেয় না তা করেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা করেন, নাবী মুহাম্মাদ যা অপছন্দ করেন বা করতে নিষেধ করেছেন তা ঐ গর্ভবতী মা করেন, তাহলে তার পেটের সন্তানের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে? একবার চিন্তা করি আল্লাহর দেয়া নিয়ামত পেটে নিয়ে আল্লাহর অপছন্দ সব কাজ করছি!

যিনি সন্তান দিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই সন্তান সুস্থ হবে নাকি অসুস্থ হবে? এই সন্তান শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকবে নাকি মরে যাবে? এই সন্তান বোবা হবে নাকি বিকলাঙ্গ হবে? এ সকল কিছু নির্ভর করছে মহান সৃষ্টিকর্তার উপর। তিনি চাইলে কাউকে সন্তান দেন আবার কাউকে সন্তান দেন না, আবার কাউকে ছেলে দেন আবার কাউকে মেয়ে দেন। তাই আমাদের সবসময় সন্তানের বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য চাওয়া উচিত, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তাঁর পছন্দ মতো কাজকর্ম করা উচিত।

- নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত শুনা।
- ইসলামের উপর অন্যান্য বই অধ্যয়ন করা।
- মানুষের সাথে আরো বেশী ভালো আচরণ করা।
- গরীবদের মাঝে দান-সদাকা করা।

- গীবত বা পরনিন্দা, কুৎসা রটনা, অহংকার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ অসুন্দর বা খারাপ কথা বলা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

- টিভি/ইন্টারনেটে অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, সিনেমা না দেখে যদি নিজেকে কন্ট্রোল করা না যায় তাহলে বাসা থেকে TV'র dish অথবা cable-এর কানেকশন কেটে দেয়া উচিত। তাহলে মন চাইলেও অন্ততপক্ষে অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, হিন্দি সিনেমা ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা যাবে।

সন্তান জন্মের আগে মা-বাবার নৈতিক দায়িত্ব

- মা-বাবা উভয়ে উত্তম ও ভাল কাজের নিয়্যত করা।

- মা-বাবা উভয়ে হালাল উপার্জন করা।

- মা-বাবা উভয়ে হালাল খাবার খাওয়া।

- ওয়াক্ত মতো দৈনিক পাঁচ সলাত আদায় করা।

- সম্ভব হলে মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করা।

- সলাতের পর তাসবীহ পাঠ করা।

- দু'জনেই খুব বেশীবেশী ভাল কাজ করা।

- প্রতিদিন আল-কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করা।

সন্তান জন্মের আগে মায়ের স্বাস্থ্যগত দায়িত্ব

- ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত চেকআপ করানোর চেষ্টা করা।

- গর্ভবতীর উপর কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিক চাপ সৃষ্টি না করা।

- পারিবারিক কলহ থেকে দূরে থাকা।

- সবার সাথে হাসি-খুশীভাবে কথা বলা।

- নিজের বাচ্চাদের মারধর না করা, তাদের সাথে ভাল আচরণ করা।

- মাঝেমধ্যে চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া।

- প্রতিদিন অবশ্যই গোসল করা এবং এবং শরীরের প্রতি যত্ন নেয়া।

- সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

- এ সময় বেশীবেশী পানি পান করা।

- গর্ভাবস্থায় সব সময় ঢিলাঢালা পোশাক পরা।
- ঝগড়া-ঝাটি না করা, কাউকে গালাগালি না করা।
- রাগ কমিয়ে হাসিখুশী থাকার চেষ্টা করা।

সন্তান জন্মের পর প্রথম দিনের দায়িত্ব

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে অন্য কোন কথা বা শব্দ শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তার কানে আল্লাহর নাম প্রবেশ করানো উত্তম। তারপর যা করণীয় তা হলোঃ

১. দু'আ করা: শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং বদ নযর থেকে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ করা। সন্তান জন্মগ্রহণের সময় যিনি কাছে থাকবেন তিনি সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। মারইয়াম-এর মাতাও স্বীয় শিশু কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সমর্পণ করেছিলেন জন্মের আগে। রসূল বলেছেন, শয়তান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত করে, ওরই কারণে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কিন্তু মারইয়াম ও ঈসা এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন। দু'আটি নিম্নরূপ:

إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

নিশ্চয় আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতারিত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। (সূরা আলে ইমরান: ৩৬)

২. শুকরিয়া আদায় করা: সন্তান জন্মের সুসংবাদ শোনার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আয়িশা(রাঃ)-এর নিকট সন্তান জন্মের সংবাদ আসলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন সন্তানটি সুস্থ-স্বাভাবিক কিনা। যদি বলা হতো হ্যাঁ তিনি বলতেন: 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন'। (সহীহ বুখারী)

৩. আযান শোনানো: নবজাতক সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান বলা সুন্নাত। এই সময় আযান মসজিদের মুয়াজ্জিনের মতো সুর করে জোরে জোরে দিতে হবে না, আযানের প্রতিটি শব্দ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে বললেই হবে।
"আবু রাফে(রাঃ) এটি বলেন, ফাতিমা হাসান ইবনে আলী(রাঃ) -কে প্রসব করলে আমি রসূলুলাহ(ﷺ) এ-কে হাসানের কানে সলাতের আযানের অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি।" (জামে আত-তিরমিযী, আবু দাউদ)

৪. তাহনীক করা : ভূমিষ্ট শিশুর মাতা সামান্য কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে রস বের করে শিশুকে মুখের লালার সাথে মিশ্রিত করে তা আঙ্গুল দ্বারা মুখের ভেতর জিহ্বার তালুতে লাগিয়ে দেয়া সুন্নাহ। (সহীহ বুখারী) তবে যাদের মুখে অসুখ রয়েছে বা যারা পান-সিগারেট খান তাদের এই কাজটি করা উচিত নয়।

দুধপান করানো: সন্তানের জন্য মায়ের পক্ষ থেকে প্রথম উপহার হলো মায়ের দুধ। এটি ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানের জন্য পরিপূর্ণ খাদ্য। এতে আল্লাহ তা'আলা শিশুর যা প্রয়োজন তার সকল উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। আজকাল কিছু কিছু মায়েরা অনেক খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুকে এ দুধ পান করা থেকে বঞ্চিত করে থাকেন অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হয় মায়ের দ্বারা সন্তানের অধিকার হরণ। অথচ একটু চিন্তা করা উচিত- মায়ের স্তনে এ দুধ কে দিল? কেন দিল? কেন এ সময়ে দিল? কেন

মায়ের স্তনে ন্যাচারালি অন্য সময়ে দুধ আসে না ইত্যাদি। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার, এমন মায়েদের আচরণে লংঘিত হচ্ছে: ক) সন্তানের অধিকার। খ) মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশ।

৫. সন্তানের কল্যাণের জন্য পিতার দু'আ করা: পিতা সন্তানের কল্যাণের জন্য বা বরকতের জন্য দু'আ করবে। যাতে সন্তান দ্বীনদার হয়, মেধাবী হয়, মুত্তাকী হয়। নাবী-এর কাছে নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসা হতো তিনি তার জন্য দু'আ করতেন। (সহীহ বুখারী)

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের দায়িত্ব

৬. উত্তম নাম রাখা: সন্তান পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন তাদের উত্তম ও সুন্দর অর্থবোধক নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি মা-বাবার কাছে সন্তানের হক। মুসলিম নামের বই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই শত শত নামের লিস্ট পাওয়া যাবে। সেখান থেকে বাছাই করে একটি সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা উচিত। খুব ভালো হয় যে, কিছু নাম পছন্দ করে কোনো যোগ্য আলেমের কাছ থেকে যাচাই করে নেয়া। কারণ অনেক সময় অনলাইনে সঠিক তথ্য নাও থাকতে পারে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

‘কিয়ামাতের দিন তোমাদের ডাকা হবে তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও বাবার নামসহ। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে।’ (আবু দাউদ)

৭. মাথার চুল কাটা: সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল কামিয়ে (মুণ্ডন) দেয়া শিশুর অধিকার। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) আলী ইবনে আবু তালিব(রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল(ﷺ) একটি ছাগল দিয়ে হাসানের আকীকা করেন এবং বলেন: হে ফাতিমা! তার মাথা কামাও এবং তার চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা দান কর।

তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হল। (জামে আত-তিরমিযী)

কোন কোন ডাক্তার শিশুর মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেন। যদিও মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী এর কোন জোড়ালো ক্ষতিকারক কারণ নেই। যেসব ডাক্তারের ইসলামের সঠিক জ্ঞান নেই তারা হয়ত এই সুন্নাহ পালনে গুরুত্ব দেন না। চুল ছেটে দেয়ার ফলে শিশুর দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৮. আকীকা করা: নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দু'টি ছাগল অথবা ভেড়া আর কন্যা হলে একটি ছাগল অথবা ভেড়া তার নামানুসারে যবেহ করা উত্তম। আকীকা করতে হয় সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে, সেদিন সম্ভব না হলে ১৪তম দিনে এবং সেটিও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে আকীকা দিতে হবে। এই কুরবানী আল্লাহর হক। অর্থাৎ সন্তান হয়েছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কুরবানী দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আকীকার জন্য অনুষ্ঠান করে সেই মাংস রান্না করে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব-দুঃখীদের খাওয়ানো যেতে পারে। আর অনুষ্ঠান করতে না চাইলে ঐ মাংস আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব-দুখীদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া যেতে পারে। রসূল(ﷺ) বলেছেন : ছেলেদের আকীকা কর অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে কুরবানীর মাধ্যমে রক্ত বইতে দাও; এবং কষ্টদায়ক বস্তু (মাথার চুল) মুন্ডন করে দাও। (সহীহ বুখারী)

আকীকা প্রসঙ্গে রসূল(ﷺ) বলেছেন: ‘পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা দাও।’ (জামে আত-তিরমিযী)

৯. ছেলে সন্তানের খতনা করানো: ছেলে সন্তানকে মুসলমানি করানো সুন্নাহ। রসূল হাসান ও হুসাইন উভয়ের আকীকা ও খতনা সপ্তম দিনে করেছিলেন। (বায়হাকী)

অবশ্যই এই কাজটি ভাল ডাক্তার দিয়ে হসপিটাল বা ক্লিনিকে নিয়ে করাতে হবে। উন্নত দেশে ছেলের মুসলমানি জন্মের কিছু দিনের মধ্যে হসপিটালে ডাক্তাররা করিয়ে দেন। উন্নত দেশের অমুসলিমরাও মুসলমানি করায় স্বাস্থ্যগত উপকারিতার জন্য। আমাদের দেশে একটি অনৈসলামী প্রথা প্রচলন আছে যে, মুসলমানির অনুষ্ঠান করা এবং সবাইকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো ও উপহার গ্রহণ করা। এই ধরনের কোন অনুষ্ঠান বা নিয়ম ইসলামে নেই। আমরা না জানার কারণে আকীকা করি না কিন্তু মুসলমানির অনুষ্ঠান করি, অর্থাৎ যেটা করার কথা সেটা করি না কিন্তু যেটা করার কথা না সেটা করি।

কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, ছেলেকে মুসলমানি করালে সে ঐ দিন থেকে মুসলিম হয়। এই ধারণা ঠিক না। প্রতিটি শিশু মুসলিম হয়েই জন্মগ্রহণ করে, এমনকি সে হিন্দু বা খৃষ্টানের ঘরে জন্ম নিলেও। পরবর্তীতে তার মা-বাবা ঐ শিশুকে হিন্দু, খৃষ্টান বা নাস্তিক বানায়। (এই কথাগুলি সহীহ হাদীসে আছে।)

শিশু সন্তানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা

তারপর সন্তান জন্ম হলে তার কপালে কালো টিপ দেয়া হয়, পায়ে কালো টিপ দেয়া হয়, এগুলোও কুসংস্কার, এগুলো করা গুনাহর কাজ। অনেকে কথায় কথায় বলে থাকে শিশুরা হচ্ছে ফিরিশতা। এই ধরনের কথাও ঠিক না। শিশুরা হচ্ছে মানুষ, তারা ফিরিশতা হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, তারা নিষ্পাপ। কিন্তু তারা ফিরিশতাদের মতো নিষ্পাপ এই কথা বলাও ঠিক না। ফিরিশতাদের জায়গায় ফিরিশতারা এবং মানুষের জায়গায় মানুষ, এই দু'টি আল্লাহর আলাদা আলাদা সৃষ্টি, কারো সাথে কারো তুলনা করা ঠিক না। মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে কিন্তু ফিরিশতাদের সৃষ্টি নূর থেকে।

আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কেউ কেউ সন্তানের গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে দেয় সন্তানকে জিন-ভূত থেকে রক্ষা করার জন্য বা কোন বদ নজর থেকে দূরে রাখার জন্য। মনে রাখতে হবে যে কোন ধরনের তাবিজ শরীরে ঝুলানো শিরক এমনকি যদিও সেটি কোন মাওলানা থেকে কুরআনের আয়াত দিয়ে লেখা তাবিজও হয়। শিশুর শরীরে কোন প্রকার কালো সূতা বা কড়ি ঝুলানো যাবে না। এমনকি কুরআনের আয়াতসহ স্বর্ণের বা অন্য কোন ধাতব পর্দাথের লকেট গলায় ঝুলানো যাবে না। এগুলো সুস্পষ্ট গুনাহর কাজ।

উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ নির্বাচন

তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কিবলামুখী ও ইবাদতের স্থান বানাও

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين(َ

"আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তাঁর ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো

কিবলামুখী করে বানাও এবং নামাজ কায়েম কর। আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।”(সূরা ইউনূস: ৮৭)

ইমাম তাবারী রহ. বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: {وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} [يونس: ٨٧] قَالَ: أُمِرُوا أَنْ يَتَّخِذُوهَا مَسَاجِد.َ

"ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন তাদের ঘরগুলোকে মসজিদে পরিণত করে। "(তাফসীরে তাবারী: ১৫/১৭২, হা. নং ১৭৭৯৪)

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন-

وَكَأَنَّ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَمَّا اشْتَدَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ مِنْ قِبَلِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَضَيَّقُوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كقوله تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ [الْبَقَرَةِ: ١٥٣] . وَفِي الحَدِيثِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرُ

صَلَّى، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.َ

"আর সম্ভবত এটা তখনকার কথা-আল্লাহ-ই ভালো জানেন-যখন ফেরাউন ও তার কওমের পক্ষ থেকে নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে গেল এবং এরা তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলল, তখন তাদেরকে বেশি বেশি নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [সূরা বাকারা: ১৫৩] সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কোনো সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি নামাজ আদায় করতেন।"(তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/২৫২ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত))

এর মাধ্যমেই ঘরে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বুঝা যায়। বিশেষভাবে দুর্বলতার সময় এবং যখন পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়ে যায় যে, মুসলমানগণ কাফেরদের সামনে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতে পারে না, তখন ঘরে নামাজ আদায় করতে হবে। আমরা এখানে মারইয়াম আ. এর মেহরাবের কথাও আলোচনা করব, যেটা ছিল তাঁর ইবাদতের স্থান। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا(

"যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন, তখনই তাঁর সামনে খাবার দেখতে পেতেন। " (সূরা আলে ইমরান: ৩৭)
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ফরয নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ ঘরে আদায় করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, এ ব্যাপারে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ

عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ

مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ

البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

মাহমুদ বিন রবী আনসারী রহ. বলেন, "বদরী সাহাবী আতবান বিন মালেক রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি চোখে কম দেখি এবং আমি আমার কওমের সাথে নামাজ আদায় করি। কিন্তু যখন বৃষ্টি আসে এবং আমার ও তাদের মধ্যে অবস্থিত উপত্যকা প্লাবিত হয়, তখন আমি তাদের মসজিদে এসে তাদের সাথে নামাজ আদায় করতে পারি না। হে আল্লাহর রাসূল, তাই আমি আশা করি, আপনি আমার বাড়িতে আসবেন এবং আমার ঘরে নামাজ আদায় করবেন। তাহলে আমি সেই জায়গাকে নামাজের স্থান বানাব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ, আমি অচিরেই এটা করব।' আতবান রাযি. বলেন, পরদিন সকালে যখন সূর্য একটু ওপরে উঠল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযি. আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের আগে কোথাও বসলেন না। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তোমার ঘরের কোন জায়গায় নামাজ আদায় করলে তুমি খুশি হবে?' তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর দিলেন। অতঃপর আমরাও তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম এবং তিনি দুই রাকআত নামাজ আদায় করে সালাম ফিরালেন। "(সহিহ বুখারি:১/৯২, হা.নং.৪২৫)

ছোট থেকেই সন্তানকে আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত করানো

পিতা-মাতার একটি জরুরি করণীয় হলো, ছোটবেলা থেকে সন্তানকে আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত, নেককাজ করানো এবং অসৎকাজের প্রতি ঘৃণার অনুশীলন করানো। শৈশব থেকেই কোনটা ভালো কাজ, কোনটা মন্দকাজ ধরে ধরে শিক্ষা দেবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের আল্লাহর আনুগত্য ও নেককাকে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং এসবের চর্চা করাতেন। প্রসিদ্ধ হাদিস আছে, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামাজের নির্দেশ দেবে। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (নামাজ আদায় না করলে) এজন্য প্রহার করবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দেবে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারভুক্ত লোকদের জন্য সদকা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁদের যাকাত ও সদকা গ্রহণে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। একবার এক শিশুকে সদকার একটি খেজুর খেতে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই এই কী করছ? অতঃপর তার মুখ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরটি ফেলে দিলেন এবং বললেন, তুমি কি জানো না, আমরা মুহাম্মদের পরিবারের লোকেরা সদকা খাই না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট থেকেই শিশুদের রোজা পালনের অনুশীলন করাতেন। একপর্যায়ে তারা ক্ষুধার্ত হয়ে গেলে পশমের খেলনা তৈরি করে দিতেন। তারা সেটা দিয়ে খেলতে থাকত এবং ক্ষুধার কথা ভুলে যেত। এভাবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত। রুবায়্যি বিনতে মুআব্বিয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আশুরার সকালে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের সকল পল্লিতে এ নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি রোজা রাখেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার

রোজা অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন রোজা পূর্ণ করে। রুবায়্যি (রা.) বলেন, পরবর্তীকালে আমরা ওই দিন রোজা পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের রোজা পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।(সহিহ বুখারি: ১৯৬০)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট থেকেই শিশুদের আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। অঙ্কুরেই তাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করে দিতেন ইসলামি আখলাক।

হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনে আবু সালামাকে বলেছেন, 'হে বৎস! তুমি বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করো এবং তোমার পাশ থেকে খাও।'(সহিহ বুখারিঃ৫৩৭৬)

শৈশবে ইকরামা (রা.)-কে কুরআন ও হাদিস মুখস্থ করানোর জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) পায়ে বেড়ি বেঁধে রেখেছিলেন।

সুতরাং পিতা-মাতাদের কর্তব্য ছোট থেকেই সন্তানদের ইসলামি আদব, আখলাক ও শিষ্টাচারের অনুশীলন করানো। তাহলে ধীরে ধীরে তাদের কচি হৃদয়ে সেসব গেঁথে যাবে। ক্রমশ যখন তারা বড় হতে থাকবে তখন তাদের প্রতি কথা, কাজ ও চালচলন ইসলামের খুশবু ছড়াবে।

সন্তানকে ইসলামের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া

পিতা-মাতার জন্য অত্যাবশ্যক হলো, সন্তানকে ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া। ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস (যেমন : আল্লাহ,

তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও শেষ দিবসে ঈমান ও পরিচয়) শিক্ষা দেওয়া। তাকদিরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমানের শিক্ষা দেওয়া। কালিমায়ে তইয়্যেবা, কালিমায়ে শাহাদাত, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, কুরআনে কারিম ও সহিহ হাদিসের শিক্ষা দেওয়া। এমনিভাবে নবি-রাসুলদের ঘটনা, পূর্ববর্তী নেকাকার ব্যক্তিদের জীবনী এবং যা কিছু মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা বানায়, যা কিছু মানুষকে আল্লাহর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেয় ইত্যাকার দ্বীনি বিষয় সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া।

সুতরাং হে পিতা-মাতা! আপনি আপনার সন্তানের সঙ্গে ঈমান ও ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা করুন। তাহলে শৈশবেই সহজে তাদের অন্তরে এগুলো গেঁথে যাবে এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য অনেক উপকারী হবে।

আপনার সন্তানকে এই হাদিস শিক্ষা দিন, যাতে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলি একত্র করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সমর এক ব্যক্তি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিল মিশমিশে কালো। সফর করে আসার সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসল। সে তাঁর হাটদ্বয় রাসুল কোন চিহ্নও তার মধে মাথার চুলগুলে আমাদের কেউই তাকে চিনেও না। অবশেসেল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাটদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিল এবং দুই হাতের তালু তার (অথবা নিজের) ঊরুর ওপর রেখে বলল, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলাম হচ্ছে এই—তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজানের রোজা পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হজ করবে। সে বললো, আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনামিদা হয় তারা.) বলেন, আমরা তার কথা শুনে

আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা সে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করছে আর (বিজ্ঞের ন্যায়) সমর্থন করছে।

এরপর সে বলল, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঈমান হলো এই যে, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, তার কিতাবসমূহ, তার প্রেরিত নবিগণ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদির ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে। সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন।

এবার সে বলল, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহসান এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তাঁকে দেখছ, যদি তাঁকে না দেখো তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।

এবার সে জিজ্ঞেস করল। আমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি কিছু জানে না। অতঃপর সে বলল, তাহলে আমাকে এর কিছু নির্দশন বলুন। তিনি বললেন, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র, বকরীর রাখালদের বড় দালান-কোঠা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে।

বর্ণনাকারী উমর (রা.) বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে উমর! তুমি কি জানো, এ প্রশ্নকারী কে ছিল? আমি বললাম, সে কে ছিল তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জ্ঞাত আছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন জিবরিল। তোমাদের কাছে তিনি তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।'(সহিহ মুসলিম;৮)

অতঃপর এই হাদিসটি সন্তানদের নিকট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করুন। ইসলামের প্রতিটি মৌলিক বিষয় তাদের নিকট সুস্পষ্ট করে তুলুন। প্রথমে ঈমান বিল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি ঈমানের আলোচনা করুন। আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরুন। আর এর জন্য এই সুরাটি তাদের শিক্ষা দিন,

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد(٤) ٌ

'বলুন, তিনি আল্লাহ; এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'(সুরা ইখলাস)

সন্তানদের শিক্ষা দিন যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র রব, তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। যদি এই বিশ্বভূমণ্ডলে এক আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো উপাস্য থাকত তাহলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا

'বলুন, তাদের কথামতো যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অন্বেষণ করত। '(সুরা ইসরা: ৪২)

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

'আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। তিনি কোনো সঙ্গিনী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই। '(সুরা জিন: ৩)

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে ডাকো তাঁর খাঁটি ইবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর। (সূরা গাফির;৬৫)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য, নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।'(সূরা আলে ইমরান;২)

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

'তোমাদের উপাস্য তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।'(সুরা তহা: ৯৮)

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম করো।' (সুরা তহা: ১৪)

আপনার সন্তানকে শিরক সম্পর্কে সতর্ক করুন এবং তাকে তাওহিদ শিক্ষা দিন। আল্লাহ তাআলা শিরককারীদের জন্য জান্নাতকে হারাম ঘোষণা করেছেন। বলেছেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'(সুরা মায়েদা: ৭২)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আপনি আল্লাহর শরিক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (সুরা যুমার: ৬৫)

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত।'সুরা আনআম: ৮৮)

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপে করে দেব।'(সুরা ফুরকান: ২৩)

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং সবচেয়ে জঘন্য পাপ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এ তো সত্যিই বড় গুনাহ। (সহিহ বুখারি: ৪৪৭৭)

আপনি আপনার সন্তানের নিকট আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরুন। তাদের শিক্ষা দিন যে, আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, তিনি রিজিক দান করেন, জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র তিনিই, তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। আপনার সন্তানকে শিক্ষা দিন, সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট কোনো কিছু আশা না করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করে।

আপনার সন্তানকে শিক্ষা দিন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দুআ করা শিরক, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে প্রাণী জবাই করা শিরক, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করা শিরক, বায়তুল্লাহ (কাবাগৃহ) ছাড়া অন্য কোনো ঘর তাওয়াফ করা শিরক, এমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে মান্নত করা শিরক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

'আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি তা-ই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।'(সূরা আনআম;১৬২,১৬৩)

এমনিভাবে আপনার সন্তানকে আসমায়ে হুসনা তথা আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ এবং তাঁর সুউচ্চ গুণাবলির জ্ঞান শিক্ষা দিন।

ফেরেশতাদের বিষয়ে আলোচনা

ফেরেশতাদের বিষয়ে সন্তানের সঙ্গে আলোচনা করবে। ফেরেশতা আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি। তাদের ব্যাপারে ঈমান আনা, তাদের অস্তিত্বের সত্যায়ন করা ওয়াজিব। এছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না। এটি হচ্ছে ফেরেশতাদের ব্যাপারে মৌলিক ধারণা।

ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। রাতদিন তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হয় না। কখনো তারা নিজেদের ইবাদত ও আনুগত্য নিয়ে অহংকার করে না। বরং তারা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে।

ফেরেশতাদের নুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের নির্ধারিত কিছু কাজ রয়েছে যা তারা নিয়মিত নিষ্ঠার সাথে পালন করে। ফেরেশতাদের একদল আরশ বহন করে। একদল ফেরেশতা আল্লাহ ও নবি-রাসুলদের মধ্যকার দূতের দায়িত্ব পালন করেছে। একদল ফেরেশতা বান্দাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করে এবং তা সংরক্ষণ করে। একদল ফেরেশতা সৃষ্টিজীবের জান কবজ করে। একদল ফেরেশতা জিকিরের মজলিসে উপস্থিত থাকে। একদল ফেরেশতা ইলমের মজলিসে উপস্থিত থাকে। একদল ফেরেশতা মুসলমানদের নামাজ আদায়ের স্থলে উপস্থিত থাকে। একদল ফেরেশতা জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের সাহায্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে, মুমিনদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং শাহাদাতের সময় তাদের সুসংবাদ প্রদান করে। একদল ফেরেশতা মৃত্যুর সময় কাফেরদের শাস্তি দেয়। এমনিভাবে অন্যান্য সকল কাজে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নিয়োগ করে রেখেছেন।

ফেরেশতাগণ আল্লাহর তাওহিদ ও একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করে। নবি- রাসুলদের নবুওয়ত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়।

ফেরেশতাগণ নারী নয়, যেমনটা কাফেররা ও অপবাদকারীরা ধারণা করে থাকে।ফেরেশতাগণ কিয়ামতের দিন মমিনদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের

সুপারিশ করবে। তবে আল্লাহ যাদের অনুমতি দেবেন কেবল তারাই সুপারিশ করতে পারবে। যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,
১৩৯

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

'আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (সুরা নাজম: ২৬)

পিতা-মাতা সন্তানকে ফেরেশতাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে এই শিক্ষা দেবে যে, ফেরেশতাগণ সর্বক্ষণ আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন, আমাদের প্রতিটি কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। আমাদের প্রতিটি কথা ও আচরণ তাদের অগোচরে নয়। আমরা যদিও ফেরেশতাদের দেখি না, কিন্তু তারা আমাদের ঠিকই দেখতে পায়।

আল্লাহ বলেছেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা-ই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।'(সূরা কাফ: ১৮)

শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক করা

পিতা-মাতা সন্তানকে শয়তানের ব্যাপারে ধারণা দেবে। শয়তান মুসলমানদের শত্রু এ কথা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেবে। শয়তান কীভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়, বিপথগামী করে, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে এ সমস্ত বিষয়ে সন্তানের সঙ্গে

আলোচনা করবে। কীভাবে শয়তান আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে জান্নাত থেকে বের করেছে এবং প্রত্যেক আদমসন্তানকে জান্নাত থেকে বের করার তার যে প্রচেষ্টা সে বৃত্তান্ত শোনাবে সন্তানকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন,

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ
الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

'হে আদমসন্তান! শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলে দিয়েছি, যেন তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদের দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখো না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।'(সুরা আরাফ: ২৭)

শয়তান মানবজাতির চিরশত্রু। তাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা শয়তানকে না দেখলেও শয়তান আমাদের দেখতে পায়। মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী করার জন্য শয়তান চূড়ান্ত পর্যায়ের লালায়িত এবং এ লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জারি রাখে। আল্লাহ শয়তান থেকে বেঁচে থাকতে পূর্বেই আমাদের সতর্ক করে বলেছেন,

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (٦٣) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
غُرُورًا (٦٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى
بِرَبِّكَ وَكِيلًا

'সে বলল, দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মার্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদের সমূলে নষ্ট করে দেব। আল্লাহ বলেন, চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি-ভরপুর শাস্তি। তই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের আক্রমণ কর, তাঁদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হয়ে যা এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেন। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না। আমার বান্দাদের ওপর তোর কোনো ক্ষমতা নেই। আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী। ২৯০৮

সেইসাথে সন্তানদের এও বলুন যে, শয়তানের চক্রান্ত বেশ দুর্বল। যারা প্রকৃত ঈমানদার এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাদের ওপর শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব নেই। শয়তান আযানের সময় পালিয়ে যায়। আল্লাহর জিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের সময় শয়তান দৌড়ে পালিয়ে যায়। ঘুমের সময় যদি আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমায় তখন সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। কেউ যদি এই দুআ একশত বার পড়বে, আল্লাহ তাকে শয়তান থেকে হেফাজত করবেন,

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

অর্থ: 'এক আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সবকিছুর ওপরে শক্তিমান।'(সূরা ইসরা:৬২-৬৫)

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

পিতা-মাতা সন্তানের নিকট আসমানি কিতাবসমূহের আলোচনা করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত রাসুলদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে আল্লাহর তাওহিদ, তাঁর প্রতি ঈমান, রাসুলদের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং হালাল-হারাম বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। সে সমস্ত কিতাবে আরও রয়েছে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বৃত্তান্ত এবং পরবর্তীকালে যা কিছু ঘটবে তার বিবরণও। আল্লাহ তাআলা প্রেরিত এই সকল কিতাবে প্রত্যেক ভালো ও কল্যাণকর জিনিসের দিকে মানবজাতিকে আহ্বান করেছেন এবং প্রত্যেক মন্দ ও অনিষ্টকর জিনিস থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করেছেন।

কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। অস্বীকার করা অথবা ঈমান না আনা কুফর এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

কিতাবসমূহের একটি হচ্ছে তাওরাত, এটি হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। একটি হচ্ছে ইঞ্জিল, এটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

এগুলোর সাথে কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী সহিফাসমূহের ব্যাপারেও আলোচনা করবে, যা হজরত ইবরাহিম ও মুসা আলাইহিমাস সালামদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসুলদের ওপর ঈমান

সন্তানের সঙ্গে নবি-রাসুলদের বিষয়ে আলোচনা করা এবং পরিচয় যথাযথভাবে তুলে ধরা। নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার বান্দা। তাঁরাও মানুষ। তবে আল্লাহ তাআলা

মানবজাতির মধ্য থেকে বিশেষভাবে তাঁদের নির্বাচন করেছেন। তাঁদের নিকট দ্বীনের বিধিবিধান প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তাঁরা মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন সেসব। যারা ঈমান আনবে, সৎকাজ করবে, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করবে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ এবং যারা ঈমান আনবে না, সৎকাজ করবে না, আল্লাহর আনুগত্য করবে না তাদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদান করেন।

নবি ও রাসুলদের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে বিশেষভাবে কয়েকজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন: হজরত নুহ, হজরত ইবরাহিম, হজরত মুসা, হজরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম ও হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সকল নবি-রাসুলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। এদের একজনকে যে অস্বীকার করবে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফের হয়ে যাবে।

বর্ষিকি রাসুলগণ সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সৃষ্টিগত, ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধা সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর আনুগত্যে তাঁরা সকলের শীর্ষে। তাদের চেয়ে বেশি আল্লাহর অনুগত বান্দা কেউ নেই মানুষের মধ্যে।

নবি-রাসুলদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। যারা তাদের অবধ্যতা করেছে ও করবে তারা সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত।

কিয়ামতের দিন নবি-রাসুলগণ মুমিনদের জন্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাঁদের সুপারিশ কবুল করবেন।

নবি-রাসুলদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি বা প্রাত্যাদেশ নিয়ে ফেরেশতার আগমন করেন। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁদের নিকট নির্দেশাবলি ও বিধিবিধান প্রেরণ করেন।

নবি-রাসুলগণ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করেন। একমাত্র আল্লাহকেই ডাকেন। আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট তাঁরা কিছু চান না। আর কারও ইবাদত করেন না।

সকল নবি-রাসুলের দাওয়াতের মূল কেন্দ্রবিন্দু এক ছিল। আর তা হলো, আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর অবাধ্যতা ও শিরক থেকে মানবজাতিকে বিরত থাকা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যারোপকারীদের কীরূপ পরিণতি হয়েছে। (সূরা নাহল: ৩৬)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون

'আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করো।(সুরা আম্বিয়া: ২৫)

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবি-রাসুলকে যুগ ও সম্প্রদায়ের অবস্থার নিরিসে শরিয়ত প্রদান করেছেন। সকলের মৌলিক দাওয়াত এক থাকলেও শরিয়তের বিধিবিধানের ভিন্নতা ছিল।

নবি-রাসুলদের আগমনের ধারা সমাপ্ত হয়েছে আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। তিনিই সর্বশেষ নবি, তাঁর পর আর কোনো নতুন নবি নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমন করবে না।

কিয়ামত দিবসের আলোচনা

সন্তানের সঙ্গে বেশি বেশি কিয়ামত দিবসের আলোচনা করবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে অনেক বেশি আলোচনা করেছেন। সন্তান যখন জানবে যে, কিয়ামত দিবসে বান্দার আমলের হিসাব নেওয়া হবে তখন সে নেককাজ বেশি করবে এবং মন্দকাজ ছেড়ে দেবে।

কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করা হবে। অতঃপর দুনিয়াতে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে হিসাব নেওয়া হবে। এবং তদনুযায়ী তাদের পরিণতি নির্ধারণ করা হবে। যাদের নেক আমলের পরিমাণ বেশি হবে তাদের ঠিকানা হবে শান্তিসুখের জান্নাত, আর যাদের গোনাহের পরিমাণ বেশি হবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

কিয়ামতের দিন হবে হিসাব চুকিয়ে নেওয়া দিন। এদিন প্রত্যেককে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে সে মাজলুম পাকড়াও করবে জালেমকে। অতঃপর তার থেকে পাওনা বুঝে নেবে কড়ায়গন্ডায়।

পিতা-মাতা কিয়ামতের আলোচনা প্রসঙ্গে সন্তানের কাছে পুলসিরাত, মিযান, হাউজে কাউসার এসবের পরিচয়ও তুলে ধরুন।

আরও আলোচনা করুন জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে। জান্নাতের ভেতর যে নেয়ামত আল্লাহ নেককারদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং জাহান্নামে অবাধ্যদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা বর্ণনা করুন দরদি ভাষায়।

তাকদিরের ওপর ঈমান

পিতা-মাতা সন্তানকে তাকদিরের ওপর ঈমান রাখার শিক্ষা দেবে। তাকদিরের ওপর ঈমান আনয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক। এছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না।

সন্তানকে এই শিক্ষা দেবে যে, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে ও ঘটছে এর সবকিছু পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ। মহান আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য সবকিছু পূর্ব হতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এটিকেই তাকদির বলে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)- কে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন পিতা-মাতাও সন্তানকে সেভাবে শিক্ষা দেবে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সময় আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন, হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি-তুমি আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধের রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে, আল্লাহ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ

তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তাআলার নিকটেই করো। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মতও তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকলেই তোমার ক্ষতি করতে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকুই ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।(সুনানে তিরমিযি:২৫১৬)

সন্তানকে এই শিক্ষা দিন যে, ভালো ও মন্দ যা কিছু জীবনে আসে তা পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের জন্য রিজিক পূর্ব থেকে বণ্টন করে রেখেছেন। কারও রিজিক কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হেদায়েত ও হেফাজত আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সন্তান কখনো অসুস্থ হলে অথবা কোনো বিপদে পড়লে তাকে বলুন যে, এসব হওয়া নির্ধারিত ছিল। সুতরাং ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর ওপর ভরসা করো।

কালিমায়ে শাহাদাতের শিক্ষা

পিতা-মাতা সন্তানকে বেশি বেশি কালিমার চর্চা করাবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এই শাহাদাতের তালকিন দেবে। এর অর্থ ও মর্ম সন্তানের নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবে।

বেশি বেশি কালিমা পড়তে উৎসাহ দেবে। কালিমা পড়লে কী সওয়াব ও মর্যাদা তা বর্ণনা করবে। তাহলে সন্তান কালিমা পড়তে অধিক আগ্রহী হবে।

মুসলিম চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য

এটা পরিষ্কার, সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি স্কুলের ওপর নির্ভর করি না। সুতরাং তারা যে সময় স্কুলে থাকে না, আমাদের উচিত সে সময় তাদের শিক্ষার বাকি অংশ পূর্ণ করা।

মুসলিম চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে পিতা-

মাতা ও সন্তানের জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কার্যকর প্রশিক্ষণের জন্য চমৎকার মানবীয় যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ প্রশিক্ষক প্রয়োজন, যিনি আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করতে পারেন। এজন্যই বলা হয়ে থাকে- একটি শিশুকে গড়ে তোলার জন্য বিশাল একটি গ্রামের প্রয়োজন। যে শিশু অনুকরণীয় মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়, সে যেকোনো জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, যেকোনো স্থানে পৌঁছতে পারে। কারণ, সে তাদের থেকে সকল ধরনের নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

প্রথম পদক্ষেপে পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের জানতে হবে, কী কী অবলম্বন আমাদের রয়েছে। সন্তানদের পেছনে আমরা কতটুকু সময় দিতে পারব।

তাদের যথাযথ উপায়ে গড়ে তোলার জন্য কতটুকু জ্ঞান রাখি ইত্যাদি। সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য বাইরের অনেক কিছুই প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ- পরিবার, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় মসজিদ, ছুটির সময় ইত্যাদি।

সাধারণত, পিতা-মাতাই সন্তানদের প্রথম শিক্ষক, রোলমডেল ও প্রশিক্ষক। সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতা বিশেষ করে মায়েদের বিশেষ এক আকর্ষণ

রয়েছে। এই আকর্ষণ পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না। জন্মের পর থেকেই সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার এই ধরনের আকর্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত, এর ওপরই একটি সফল মুসলিম প্রজন্মের বেড়ে উঠা নির্ভর করে। ভালোবাসা

ও দয়া এমন বিষয়, যার মাধ্যমে ভয় ও রূঢ়তাকে কাটিয়ে সন্তানদের সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে শিক্ষা প্রদান করা যায়।

নিচে কিছু পরীক্ষিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তুলে ধরা হলো, যা মুসলিম চরিত্র গঠনে নিজ ঘরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপদেশ, শাসন ও সতর্কীকরণ: পৃথিবীর বুকে যত নবি-রাসূল ও প্রজ্ঞাবান মানুষ আগমন করেছেন, তাঁদের সবাই নিজ সম্প্রদায়ের প্রশিক্ষণের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। পবিত্র কুরআনে পুত্রকে উদ্দেশ্য করে লোকমান -এর চমৎকার উপদেশ বর্ণিত রয়েছে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য উপযুক্ত সময়ে যথাযথ ও সংগত উপায়ে সন্তানদের উপদেশ দিতে হবে। রাসূল মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বিষয়ে এমনভাবে উপদেশ দিতেন, যাতে তাদের অন্তরে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কঠোরতা অবলম্বন করতেন না।

উপমা দেওয়া এবং গল্প বলা: মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে পূর্বের জাতিসমূহের ঘটনা অত্যন্ত সুন্দর উপায়ে বর্ণিত হয়েছে, যাতে মানুষ সতর্ক এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। একটি 'উত্তম কথা একটি উত্তম গাছের ন্যায়', অপরপক্ষে 'খারাপ বা মন্দ কথা একটি ক্ষতিকর বৃক্ষের ন্যায়।' এই উপমাটি পবিত্র কুরআনে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে। ঈসা (আঃ)ও মুহাম্মাদ (ﷺ) সাথিদের নিকট কিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উত্তম উপমা প্রদান করতেন। রাসূল(ﷺ) মানুষের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারে সক্ষমতাকে বৃষ্টির পর মাটির প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের অন্তরে উপমা ও গল্পের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এগুলো মানুষকে জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সামনে বাস্তব ঘটনার বর্ণনা ও উপমা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করা। প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই ঘুমোনোর সময় শিশুদের গল্প বলার কার্যকর প্রভাব রয়েছে।

অনুকরণীয় আদর্শ: রাসূল(ﷺ)
মানবজাতির নিকট অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। (সূরা আহজাব: ২১)

তিনি অনেক কাজে সাহাবিদের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন। যেমন: মসজিদে নববি নির্মাণ এবং খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননসহ আরও অনেক কাজে তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সর্বোত্তম পিতা, সঙ্গী ও সহযোদ্ধার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। শিশুদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণে রোলমডেলের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। পিতা-মাতাকে সন্তানদের জন্য যোগ্য রোলমডেল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

পুরস্কার ও শাসন: আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে জাহান্নাম সৃষ্টি করছেন, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারী এবং অসৎ কর্মশীলদের শাস্তির জন্য। রাসূল সাহাবিদের উত্তম কাজের জন্য প্রশংসা এবং তাঁদের অগ্রহণযোগ্য আচরণের জন্য মাঝেমধ্যে শাসন করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনজন সাহাবির তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শনের শাস্তি উল্লেখযোগ্য। শিশুদের জীবনের বাস্তবতা বোঝানোর ক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানদের ভালোবাসার মাধ্যমে একমাত্র যৌক্তিক কারণেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি তাদের এটাও জানিয়ে রাখতে হবে, অগ্রহণযোগ্য আচরণের জন্যই তাদের শাসন করা হচ্ছে। তাদের প্রতি পিতা-মাতার নিঃশর্ত ভালোবাসার কথাও তাদের অন্তরে উপলব্ধি করাতে হবে।

প্রতিদিনের রুটিনে নিম্নোক্ত কাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে-

• প্রাত্যহিক কাজে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত বিধানের অনুসরণ করুন, যাতে সন্তানরাও এর সাথে পরিচিত হতে পারে। এর মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান, আল্লাহর স্মরণ, বিভিন্ন সময়ে রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত।

• যথাসময়ে সালাত আদায় করুন। এই ক্ষেত্রে নামাজের নির্দিষ্ট সময়ে মোবাইলে আজানের টিউনকে অ্যালার্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে,যা দিনে পাঁচবার সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। মসজিদ যদি বাসার কাছেই অবস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে-নিজ সন্তানকে প্রতিনিয়ত জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে নিয়ে যাওয়া।

• প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন, যা মুসলমানদের জীবনবিধানের মূল উৎস। প্রত্যেক ঘরে কুরআনের একাধিক কপি ও প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ থাকা উচিত। এই সকল গ্রন্থসমূহ দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

• নিজ ঘরে প্রত্যেক দিন কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম জারি রাখুন, যাতে শিশুরা এই অভ্যাসটি অর্জন করতে পারে। সিডি কিংবা মোবাইলে কুরআন তিলাওয়াত রাখতে পারেন। অবসর সময় কিংবা গাড়িতে কাটানো
সময়গুলো কুরআন শ্রবণের মাধ্যমে কাজে লাগানো যেতে পারে।

• আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা করতে সন্তানদের উৎসাহিত করুন। তাদের বোঝান, আমাদের পুরো অস্তিত্ব এবং চারিদিকের মনোরম সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। প্রকৃতিতে ঋতুর পরিবর্তন,

প্রস্ফুটিত ফুলসহ আল্লাহর সকল সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর মহিমা তুলে ধরুন।

• প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করুন, যাতে সন্তানরা তাদের উপযুক্ত বন্ধু সহজেই বাছাই করতে পারে।

• নিকটাত্মীয়দের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। এটি শিশুদের মাঝে সমাজবদ্ধ হওয়ার দক্ষতা এবং অন্যদের সাহায্য করার আগ্রহ তৈরি করে। মানবসেবায় এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নবিদের সুন্নাহ, যা এক অনন্য সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান।

• নিয়মিত পারিবারিক বৈঠকের আয়োজন করুন। এটি পরিবারের বন্ধনকে আরও দৃঢ় এবং ইসলামি হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বৃদ্ধি করে। রাসূল ও সন্তানদের সঙ্গে পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। অভিভাবকরা পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সন্তানদের থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। এতে তারা পারিবারিক বিষয়ে আরও আগ্রহী হয়।

• সহোদরদের মাঝে কুইজ সন্ধ্যা, মুখস্থকরণ প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। ইসলাম জ্ঞান ও তাকওয়াভিত্তিক প্রতিযোগিতার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতা তরুণদের নেতৃত্বগুণের বিকাশ ঘটায়।

• সন্তানদের মুসলিম বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করুন। এটি তাদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্ভাবনা সম্পর্কে উপলব্ধি তৈরি করে। তারা এই সকল বিষয়ে কল্যাণ অর্জনে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হয়। নিজ ঘরে প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও সমসাময়িক জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন সামগ্রী রাখুন। এতে সন্তানরা বর্তমান বিশ্বের চলমান ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত থাকতে পারবে।

• সন্তানদের জন্য ইতিবাচক বিনোদনের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা অমূলক ও অশালীন বিনোদন থেকে বেঁচে থাকতে পারে। শিল্পকলা, বাগানে ফুলের চাষ, রান্নাবান্না, অধ্যয়ন, চিড়িয়াখানা পরিদর্শন, পার্কে নিয়ে যাওয়াসহ আরও অনেক সুস্থ বিনোদন রয়েছে-যা শিশুদের শালীন উপায়ে বিনোদিত করতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন বর্তমান সময়ে এত চ্যালেঞ্জিং কেন?

সেকালের (-৭০, -৮০-এর দশকে বা তারও আগে যাদের জন্ম হয়েছে) বাবা- মায়েদের সন্তান লালনপালন সম্পর্কে তেমন পদ্ধতিগত বা অ্যাকাডেমিক জানাশোনা ছিল না, অর্থাৎ কীভাবে সন্তানকে বড় করতে হবে, পড়াশোনা করাতে হবে, কী খাওয়াতে হবে, কার সাথে মিশতে হবে-এসব নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা ব্যক্তিগত পর্যায়েও খুব বেশি সচেতনতা ছিল না। পিতামাতারা শিক্ষায় এবং অর্থনৈতিকভাবেও অনেক পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু তারপরও দেখা যায়- সেইসব পরিবার থেকে অনেকেই দায়িত্ববান এবং সুসন্তান (ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সুসন্তান বলতে যে সন্তান দায়িত্ববান এবং আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল) হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত,কোন পরিবারে মার পড়াশোনা ছিল প্রাইমারি পর্যন্ত, বাবা কলেজ থেকে বি.কম পাশ করে সরকারি ছা-পোষা চাকরি করতেন। অল্প বেতনে নয় সদস্য-বিশিষ্ট পরিবার (চার ভাইবোন এবং চাচাতো ভাইবোন মিলে) চলত। শুধু অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেই পিতাকে সবসময় চিন্তায় অস্থির থাকতে দেখেছি। পড়াশোনা নিয়ে তিনি এত সচেতন ছিলেন না, শুধু খেয়াল রাখতেন ঠিকমতো স্কুলে যাচ্ছি কিনা। তিন ভাইয়ের দুজন ইঞ্জিনিয়ার আর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/গবেষক (এদের দুজন আবার পিএইচডি করেছেন)। সবাই সুসন্তান হিসেবে যার যার পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের দেশে এরকম ঘটনা অহরহ দেখা যায়, এমনকি নিরক্ষর এবং দরিদ্র পরিবার থেকেও অনেকে

সুসন্তান হয়েছেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা তাদের সফল মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে বাধা তৈরি করেনি।

এখন ঘরে ঘরে শিক্ষিত ও জ্ঞানী যোগ্য পিতামাতা, এবং তারা অর্থনৈতিকভাবেও যথেষ্ট সচ্ছল, কিন্তু সেই তুলনায় তাদের সন্তানদের মাঝে দায়িত্ববান হয়ে ওঠার হার তেমন আশাপ্রদ নয়। তাহলে মূল সমস্যা কোথায়?

আগের দিনে সন্তান বেড়ে ওঠার জন্য সহায়ক সামাজিক পরিবেশ ছিল, যেখানে মানবীয় মূল্যবোধের চর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো, অর্থাৎ ভ্যালু বেইজড সোস্যাইটি ছিল। তখন অনেক চ্যালেঞ্জ (যেমন: খাবারের কষ্ট, যাতায়াতের কষ্ট, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি) থাকলেও সেই প্রতিকূলতাগুলো দায়িত্বশীল এবং যোগ্য মানুষ তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। সেসময় সন্তানরা পিতামাতার ত্যাগ, পরিবারের অভাব-অনটনকে অনুধাবন করত, যা তাদেরকে প্রকৃত মানুষ হতে ভেতর থেকে অনুপ্রাণিত করত। আগের দিনে সন্তান লালন-পালনে সমাজ এগিয়ে আসত, দায়িত্ব নিত, তখন সমাজের 'চোখ' বলে একটি ব্যাপারও ছিল। যেমন: সে-সময়ে উঠতি বয়সে যারা ধূমপান করত, তারা তা লুকিয়ে করত। পাড়ার প্রতিবেশী আঙ্কেল-আন্টিকে আমরা খুব সমীহ করতাম। পিতামাতারাও তাদের ফিডব্যাক বা পর্যবেক্ষণকে খুব গুরুত্ব দিয়ে সন্তানকে শাসন করতেন। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক পরিবেশটা এতটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এত দ্রুতগতিতে সবকিছু পাল্টাচ্ছে যে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আজকাল প্রবলভাবে দৃশ্যমান।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের সামনেও দৃষ্টিকটুভাবে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে ধরে থাকতে দেখা যায়, এমনকি পাবলিক প্লেসে অশ্লীলতা করতে কারও কোনো সংকোচ বা বিবেকবোধ কাজ করে না। আরও খারাপ লাগে, যখন দেখি-

বাহ্যিকভাবে ইসলামি পোশাক পরিহিতারাও অপসংস্কৃতিকে বরণ করে নিচ্ছে, তাদের মধ্যেও নেই তেমন পাপবোধ।

শিক্ষকরা দেখছেন, কিন্তু কেন জানি আগের দিনের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো সরাসরি বলতে সাহস পাচ্ছেন না, অর্থাৎ সেই আবহ এখন উঠে গেছে। শিক্ষকরা শুধু আফসোস করেন। আমার ভয় হয়-এই অবস্থা চলতে থাকলে বেশি ভুক্তভোগী হবে আমাদের সমাজের নারীরা। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এখন ভিডিও সহজেই ভাইরাল হয়ে যায়, বিশেষ করে মন্দ জিনিস বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি- কোনো স্বাভাবিক পিতামাতা তাদের সন্তানদের এমন হাল দেখতে চাইবেন না।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে পাবলিক প্লেসে স্বাভাবিক শালীনতা বজায় রাখতে যাদের ন্যূনতম বিবেচনাবোধ কাজ করে না, ড্যামকেয়ার অ্যাটিটিউড দেখায়, তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে (পরিবার এবং চাকরি) আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার কথা নয়। যেকোনো সফলতার মূলে কাজ করে শৃঙ্খলাবোধ। যারা নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না, তাদের ক্যারিয়ার এবং পরিবার গঠনে বাধার সম্মুখীন হওয়ার কথা। বর্তমান সময়ে আবহমান কাল থেকে গড়ে ওঠা সেই 'সমাজের চোখ' হারিয়ে গেছে।

সেকালে ধর্ম-কর্ম পালনকারীদের (যেমন: সালাত আদায়কারী, হিজাবধারী ইত্যাদি) সংখ্যা কম থাকলেও, অর্থাৎ এখনকার মতো বাহ্যিক (ভিজিবল) দিকটা ততটা বেশি না থাকলেও বয়োজ্যেষ্ঠরা সামাজিক মূল্যবোধ বা ভ্যালুজ-সংক্রান্ত বিচ্যুতি হলো কিনা, তা নিয়ে সচেতন ছিলেন। বর্তমানে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং ভোগ্য পণ্যের প্রাচুর্যতার ফলে নিজেকে সংযত করার মানসিকতা কমে গেছে, অর্থাৎ আমাদের সমাজে মানুষের মাঝে আত্মসংযমের দক্ষতায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিষয়টি সহজে অনুধাবনের জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন: কারও পাঁচ সেট পোশাক হলে ভালোভাবে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার কথা, কিন্তু সে ৫০ সেট পোশাক কিনে আলমারি ভর্তি করে রেখেছে। এটি মূলত যতটুকু না প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি হলো অন্যকে দেখানো বা আমার অনেক জমা আছে-এই ধরনের একটি মানসিকতা। আবার ধরুন, কারও এক প্লেট খাবার হলেই চলত, কিন্তু সে বিভিন্ন আইটেমের ১০ প্লেট খাবার অর্ডার দিয়ে বসল, সে আসলে এক প্লেট খাবারই খায়, কিন্তু বাকিগুলো একটু চেখে নষ্ট করে। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন-আগে মানুষেরা সাধারণ রেস্টুরেন্টে খেয়ে তৃপ্তি পেত। কিন্তু এখন ফাইভ স্টার হোটেলে খেতে না পারলে, অথবা নতুন মডেলের আইফোন কিনতে না পারলে তারা অনেকেই নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ ভাবা শুরু করে। মোদ্দাকথা, আমাদের থেকে আত্মসংযম করার অভ্যাস উঠে গেছে, আমরা ক্রমশ ভোগবাদী তথা কনজিউমারিজম মানসিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছি।

সেকালে বাবা-মায়েদের সময়কার চ্যালেঞ্জগুলো ছিল মূলত শারীরিক (hardship), কিন্তু এখনকার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানসিক। মনের ইচ্ছা তথা ভোগবাদী মানসিকতার ওপর ভিত্তি করেই পুরো বিশ্বের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যেখানে ইসলাম ধর্ম পালনকারীরাও সেই লাইফস্টাইল বেছে নিচ্ছে।

মানসিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কঠিন। তাই দেখা যাচ্ছে- অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলো শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়ে থাকলেও অনেক বছরের নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ থেকে তারা বিচ্যুত। মনের ইচ্ছাকে তৃপ্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠেছে মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের বিজনেস, যেমন: পর্নোগ্রাফি, ডিজিটাল মিডিয়া, প্রসাধনী সামগ্রী। শুধু তা-ই নয়, মেয়েদের স্তনের আকার বড় করতে গড়ে উঠেছে কমপক্ষে ১০ বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি, এমনকি মেয়েদের গোপন অঙ্গ যোনিকে আকর্ষণীয় করতেও (labioplasty) গড়ে উঠেছে বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি। নতুন নতুন জীবনদর্শন, যেমন:

এলজিবিটি বা ট্রান্সজেন্ডারের ব্যানারেও গড়ে উঠছে সেক্সুয়াল রি-কন্সট্রাকশন সার্জারি এবং হরমোন থেরাপির মতো বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি।

আত্মসংযম বা সেলফ-কন্ট্রোলের অভাবে বর্তমান সময়ের মানুষজন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। যার কারণে তৈরি হয়েছে ভোগবাদী মানসিকতা তথা আত্মকেন্দ্রিকতার সমাজব্যবস্থা। তাই আগের দিনে সন্তান লালনপালনের যে সামাজিক সাপোর্ট বা সহযোগিতা ছিল, তা থেকে বর্তমানের পিতামাতারা বঞ্চিত। এ যুগের সন্তান প্রতিপালনের বোঝা বা চ্যালেঞ্জ একমাত্র পিতামাতাকেই বহন করতে হয়, কেননা আগের দিনের মতো সমাজ আর এগিয়ে আসে না।

নীতি-নৈতিকতা, আত্মসংযম, ব্যক্তিসত্তা তৈরি হয় কৈশোরে মস্তিষ্ক বিকাশের মাধ্যমে। এই মূল্যবোধগুলো যদি সঠিক সময়ে বিকশিত না হয়, তবে তা পরবর্তী সময়ে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন বা প্র্যাক্টিস করা অনেক দুরূহ ব্যাপার। আমাদের সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে ভোগবাদী বাণিজ্য-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যে সম্পর্কে আমাদের দেশের পিতামাতারা অন্ধকারে রয়েছেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সন্তান প্রতিপালনে বর্তমান সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালঞ্জের ব্যাপকতা (এলজিবিটি, পর্নোগ্রাফি, মাদকাসক্তি, স্ক্রিনটাইম, অপর্যাপ্ত ঘুম, ভিডিও গেমস ইত্যাদি) তুলে ধরা হয়েছে। বেশে শিশুর বিকাশ এখানে হয়, সেগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা। এখানে নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আত্মসংযম, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা-এই বিষয়গুলো বর্তমানের বিজ্ঞান গবেষণা ও চর্চার অংশ নয়। মুসলিম হিসেবে আমরা পিতামাতারা চাই-আমাদের সন্তান এবং তাদের বংশধররা যেন পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্য অর্জন করে। তাই মনে যা চায়, তা আমরা করতে পারি না। মুসলিম হিসেবে আমাদের সুনির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে আত্মসংযমকেই মূলত লালন করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে একটি বিখ্যাত গবেষণার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এটি হচ্ছে সুবিখ্যাত Standford Marshmallow experiment, যেখানে দেখা গিয়েছে- যারা তাৎক্ষণিক তুষ্টির (Immediate gratification) বদলে বিলম্বিত তুষ্টিকে (Delayed gratification) পছন্দ করে, তারা জীবনের মোটামুটি সবক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে এবং সফল হয়। এটি ৪০ বছরব্যাপী পরিচালিত একটি গবেষণা। এই গবেষণা থেকে আরও যে বিষয়টি উঠে এসেছে, তা হলো-ধৈর্য বা আত্মসংযম গুণটি কিছুটা জন্মগত হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগই শেখা যায় (learned skill)। শেখার জন্য শৈশব এবং কৈশোরকালের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেক পিতামাতার সুযোগ রয়েছে সন্তানকে আত্মসংযম শেখানোর।

আমরা কি চাই এই প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের সন্তানের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি হোক?

একসময় আধুনিক ছেলেমেয়েরা রেডিও শুনতো না। কিন্তু যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন ছেলেমেয়েরা নিয়মিত রেডিও শুনে মোবাইলের মাধ্যমে। বাংলাদেশে এখন কয়েকটি রেডিও চ্যানেল চালু হয়েছে। এই চ্যানেলগুলো উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। কারণ এই চ্যানেলগুলো ছেলেমেয়েদের অবাধ প্রেম নিবেদনের মিডিয়া হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে তারা তাদের ভালবাসা-ভালোলাগার কথা ব্যক্ত করতে পারে। এছাড়া টিভি চ্যানেলগুলোতেও এই জাতীয় প্রোগ্রামও চালু হয়েছে যার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা তাদের প্রথম (ক্রাস) ভালোলাগার কথা ব্যক্ত করে। এছাড়া আরো রয়েছে মোবাইল কোম্পানীগুলোর রাত বারটার পর ফ্রী টক টাইম ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ প্যাকেজ যার মাধ্যমে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের অবাধ এবং সীমাহীন কথোপকথোন। এরপর তো রয়েছে ফেইসবুকের মাধ্যমে অবাধ বুন্ধুত্ব। সারাদিন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং বাইরের পরিবেশ তারপর ডিসের মাধ্যমে ঘরে ঘরে হিন্দি চ্যানেলে সিনেমা, নাচ, গান, সিরিয়াল।

চারিদিক দিয়ে আমাদের সন্তানদের আক্রমণ করছে! কোথায় যাবে তারা? পালাবার কোন রাস্তা নেই! কুরআনের ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি যে, পূর্বে যখন একেকটা জাতি এভাবে পাপের সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন আল্লাহ সেই জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, লুত জাতি। আমাদের সামনেও মহাবিপদ! চারিদিকে আগুন, আমাদের সন্তানরা এই আগুনের মধ্যে বসবাস করছে।

আমাদের সন্তানদেরকে এই আগুন থেকে রক্ষা করতে হলে একটিই পথ আর তা হচ্ছে তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে সর্বপ্রথমে তাদেরকে ঈমানের উপর সঠিক জ্ঞান দিতে হবে। এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা বাড়াতে হবে। এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা ও তাকওয়া সম্পর্কে খুব ভালভাবে পড়তে হবে। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আমরা শিখতে পারবো কীভাবে ঈমানকে মজবুত করা যায়, কীভাবে ঈমানকে renew করা যায়, কীভাবে ঈমানের উপর টিকে থাকা যায় ইত্যাদি। আর তাকওয়ার মাধ্যমে জানতে পারবো কীভাবে আল্লাহকে ভালবাসা যায় এবং তাঁর ভালবাসা অর্জন করা যায়, কীভাবে আল্লাহর প্রতি ভয় বাড়ানো যায়, কীভাবে আল্লাহর প্রতি সচেতনতা বাড়ানো যায় ইত্যাদি।

আমরা কি এখনও সাবধান হবো না?

১. আমি কি জানি সন্তানদের মনে নিয়মিত কালচার আর ফ্যাশনের নামে আল্লাহবিরোধী বিশ্বাস ঢুকছে?

২. আমি কি জানি স্কুল-কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি থেকেই তারা নানা রকম শিরকে লিপ্ত হচ্ছে?

৩. আমি কি জানি কী ধরনের বই তারা পড়ে? এবং এই গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে স্লো-পয়জনে তারা কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে?

৪. আমি কি জানি তাদের কাছে এডাল্ট ডিভিডি বা পর্নগ্রাফী আছে কি না?

৫. আমি কি জানি তারা কী ধরনের গান শুনে? আর অনেক গানের কথাই তো শিরক মিশ্রিত!

৬. আমি কি জানি ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে আমি এবং আমার সন্তানেরা নানা রকম সুন্নাতের বিপরীত "বিদ'আতী" কাজ করে যাচ্ছি?

৭. বেশীরভাগ স্কুল-কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে ইসলামী নীতি-নৈতিকতা শেখানো হয়।

৮. আমি কি জানি ১৩ (সাবালিকা) বছর বয়স থেকে আমার মেয়ের উপর পর্দা ফরয?

৯. আমার কন্যা পর্দা না করার কারণে যারা তাকে দেখে চোখ ও মনের জিনায় লিপ্ত হচ্ছে তাদের এ কবীরা গুণাহের জন্য আখিরাতে আমি দায়ী হবো সে কথাটা ভেবে দেখেছি কখনো?

মা-বাবার আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলে

- আমরা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে ঝগড়া-ঝাটি করি?

- আমরা কি একে অপরকে রাগের মাথায় গালাগালি করি বা জিনিসপত্র ভাঙ্গি?
- আমরা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে মিথ্যা কথা বলি?
- আমরা কি একজন আরেক জনের বদনাম সন্তানদের নিকট বা অন্যের নিকট করি?
- আমরা কি প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের গীবত করি?
- আমরা কি অন্যের হক নষ্ট করি?
- আমরা কি অবৈধ ইনকাম বা ব্যবসার সাথে জড়িত?
- আমরা কি টিভিতে আপত্তিকর মুভি বা অনুষ্ঠান দেখি?
- আমরা কি সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করি বা গায়ে হাত তুলি?
- আমরা সন্তানদেরকে দিয়ে কি মিথ্যা কথা বলাই?

মা-বাবাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন

- সন্তানের বন্ধুদের যেন বাসায় আসতে দেই এবং আমিও তাদের সাথে নিয়মিত মেলামেশা করি।

- সন্তানের পারসোনাল রুমে টিভি বা কম্পিউটার না দিয়ে কমোন জায়গায় রাখার চেষ্টা করি। (যেমন ড্রইং রুমে বা লিভিং রুমে) মাঝে মাঝে স্কুল এবং কলেজে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে পারি এবং শিক্ষক- শিক্ষকাদের সাথে কথা বলতে পারি।

- টিভিতে আজেবাজে হিন্দি মুভি এবং সিরিয়াল দেখা বাদ দেই এবং শয়তানের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করি।

- কখনো অন্য কোন পরিবারের সাথে দুনিয়াবি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় না করি।

- মা-বাবারা ইসলামিক মাইন্ডেড পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব করি।

- বাড়িতে নিয়মিত কুরআন-হাদীসের আলোচনা ও সলাত আদায় করার পরিবেশ তৈরী করি।

সন্তানদেরকে কখনো মিথ্যা আশ্বাস না দেই। যেমন: এই কাজটা করলে ঐ জিনিসটা দিব কিন্তু দেখা গেল যে সে কাজটি করল কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখলাম না। এই ধরনের আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলে।

শেষ-কথা

একজন ব্যক্তি জীবনভর যে আদর্শ ও মূল্যবোধ ধারণ করে বেঁচে থাকে সেটাই তার অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি অন্যান্য সকল বিষয়ের ভিত্তি। আদর্শের ভিত্তিতে একজন মানুষের সকল কার্যক্রম প্রভাবিত হয়। যেমন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, আচার-আচরণ, সামাজিক লেনদেন, আবেগ-অনুভূতি এবং সর্বোপরি আখিরাতের চূড়ান্ত গন্তব্য। যদি কেউ জীবনভর অমুসলিম থাকে কিন্তু জীবনের

শেষভাগে এসে ইসলাম কবুল করে নেয়, তবুও সে মুসলিমদের একজন হয়ে যাবে এবং এভাবে আল্লাহর রহমতে জান্নাতবাসীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আবার কোনো ব্যক্তি জীবনভর নানা রকম ভালো আমল করেও যদি কাফির হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে তার আমল বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না। এই দুটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ইসলামি মানদণ্ডের ভিত্তিতে। একজন ব্যক্তির বিশ্বাস, ঈমান, আদর্শ, জীবনের মূল্যবোধ ইত্যাদির গুরুত্ব বুঝতে পারি।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের দীর্ঘ তেরো বছর ধরে আকীদার মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বীনের ব্যবহারিক আমলসমূহ শেখানোর পূর্বে তিনি তাদের অন্তরে ঈমান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা নিশ্চিত করেছেন। ফলে তাঁরা এমনভাবে জীবনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন যে-স্বেচ্ছায় ইসলামের জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করেছেন। ঈমানের একটি নিদর্শন হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামি মূল্যবোধ ও আদর্শের জন্য দুনিয়ার সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকা। ইসলামি আকীদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ঈমানের রুকনসমূহের উপর। আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসূল, কিতাবসমূহ, বিচার-দিবস তথা আখিরাত ও তাকদীরের উপরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ছয়টি রুকন। দৈনন্দিন নানাবিধ কার্যক্রম ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তানদের মন মগজে এই বিশ্বাসগুলো গেঁথে-দেওয়া মুসলিম পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। সব সময় যেন ছোটদের হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে আল্লাহ তাদের প্রতিটি কথা, কাজ, চিন্তা এমনকি অনুভূতি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। এই অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তারা স্বেছায় ভালো-মন্দ পৃথক করার যোগ্যতা অর্জন করবে-সেই কাজটাই বেছে নিবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। কষ্ট, ভয়ভীতি বা প্রলোভনেও তাদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না।

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সন্তান-প্রতিপালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমাদের প্রতিটি কাজ এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিশুরা সারা জীবন প্রভাবিত হবে। এই প্রভাবের ব্যাপ্তি দুনিয়া থেকে আখিরাতের অনন্তজীবন পর্যন্ত। শিশুর ঈমানের পরিচর্যা এবং পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও সহায়তা আমাদেরকেই প্রদান করতে হবে। এভাবে ইন শা আল্লাহ একদিন আমরা আমাদের সন্তানকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বড় হতে দেখব। সে ইসলামি পরিচিতি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় হবে এবং যেভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করা উচিত সেভাবেই ধারণ করবে।

যে সন্তান কখনও ইসলাম সম্পর্কে জানেই নি তার ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কখনও তৈরি হবে না। ইসলামের ভিত্তি শিশুমননে প্রবেশ করাতে হবে জন্মের সূচনালগ্ন থেকেই। আমাদের তথাকথিত উগ্র আধুনিক সমাজে সন্তাদেরকে আমরা এমনভাবে দুনিয়া মুখি করে তুলি যে তারা পরবর্তীতে কখনই আর ইসলামের পথে ফিরে আসেনা। যে ইসলাম সম্পর্কে জানে না, সে ইসলামের কল্যাণেও আসবে না। পিতামাতা যদি ভাবেন, সন্তান বড় হলে তারপর তাকে দ্বীন শিক্ষা দিবো - এভাবনা নিতান্তই ভুল। সন্তানকে দ্বীনের শিক্ষা দিতে হবে বাল্যকাল থেকেই। যে সন্তান ইসলাম সম্পর্কে জেনে বড় হবে সে কখনই বেদ্বীন হবে না। ইনশাআল্লাহ জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে দ্বীনের উপর অটল থাকবে।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُقَدِّمُوۡا بَيۡنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۱﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরাহ হুজরাত, ৪৯ : ১)

আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠাকে করুন করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদেরকে নেক হায়াত দান করুন। হালাল জীবন ও জীবন উপকরণ দান

করুন। আমাদের নেক সন্তান দান করুন, তাদেরকে উত্তমরুপে ইসলামের আর্দশ হিসেবে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন। যাকিছু দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উত্তম এবং কল্যাণকর আল্লাহ তায়ালা সর্বাবস্থায় আমাদেরকে তাই দান করুন।আমিন!

রেফারেন্স

- আল-কুরআন

- আল- হাদিস

অন্যান্য বইসমূহঃ

- *নববি তরবিয়ত*
- *শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা*
- *ইসলামের প্যারেন্টিং ভাবনা*
- *সৎ সন্তান গড়তে হলে*
- *সন্তানঃ স্বপ্ন দিয়ে বোনা*
- *আদর্শ পরিবার*
- *প্যারেন্টিং*
- *সন্তান প্রতিপালন এ যুগের চ্যালেঞ্জ*
- *সন্তান গড়ার কার্যকর কৌশল*
- *মুসলিম প্যারেন্টিং*